উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা পর্যায়

তৃতীয় সেমেস্টার

ঐচ্ছিক পত্র ৩০৫

উপন্যাস (বিশ শতক)

পর্যায়–খ

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:

The Registrar,

University of North Bengal,

Raja Rammohunpur,

P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,

West Bengal, Pin-734013,

India.

Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008

Fax: (0353) 2776313, 2699001

Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in

Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায় ক

একক ১ - বাংলা সাহিত্যে ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

একক ২ – অন্তঃশীলা ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

একক ৩ - অন্তঃশীলা চরিত্র বিচার

একক ৪ – বাঙলা উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী

একক ৫ - মহাশ্বেতা দেবী ও অরণ্যের অধিকার

একক ৬ – অরণ্যের অধিকার উপন্যাসের প্রেক্ষাপট

একক ৭ - অরণ্যের অধিকার উপন্যাসের চরিত্রবিচার ও নামকরন

পর্যায় –খ

একক ৮ – সমরেশ বসু।

একক ৯ - গঙ্গা উপন্যাসের কাহিনিচিত্রণ।

একক ১০ – গঙ্গা উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণ ও অপ্রধান চরিত্রের গুরুত্ব আলোচনা।

একক ১১ - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জীবন ও সাহিত্যসৃষ্টি।

একক ১২ - বারো ঘর এক উঠোন।

একক ১৩ - বারো ঘর এক উঠোন ও প্রধান চরিত্র

একক ১৪ - সামাজিক উপন্যাস বিচারে বারো ঘর এক উঠোন ।

সফট পত্র-৩০৩ (আবশ্যিক) বাংলা উপন্যাস (বিশ শতক)

পর্যায় – খ

একক ৮ : সমরেশ বসু- জীবনদৃষ্টি ও সাহিত্যকর্ম, সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের দৃষ্টিকোণ, গঙ্গা উপন্যাস ও লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা।

একক ৯ : গঙ্গা উপন্যাসের কাহিনিচিত্রণ- গঙ্গা উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা,জলকেন্দ্রিক উপন্যাসের সঙ্গে সমরেশ বসুর গঙ্গার সংযোগ।

একক ১০ : গঙ্গা উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণ ও অপ্রধান চরিত্রের গুরুত্ব আলোচনা- পাঁচু, নিবারণ, বিলাস।

একক ১১ : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জীবন ও সাহিত্যসৃষ্টি- লেখক জীবনের আরম্ভের কথাসাহিত্যসৃজনের বিপুল সম্ভার (উপন্যাস ও ছোটগল্প)।

একক ১২ : বারো ঘর এক উঠোন- দেশ কাল ও সমাজ,অপ্রধান চরিত্র ও উপকাহিনির সংযুক্তিকরণ।

একক ১৩ : বারো ঘর এক উঠোন ও প্রধান চরিত্র- বারো ঘর এক উঠোন ও প্রধান চরিত্র শিবনাথ – বারো ঘর এক উঠোন উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

একক ১৪ : সামাজিক উপন্যাস বিচারে বারো ঘর এক উঠোন- ভাষা ও শৈলীগত বিচারে বারো ঘর এক উঠোন।

একক – ৮ সমরেশ বসু

বিন্যাস ক্রম

৮.১ সমরেশ বসু- জীবনদৃষ্টি ও সাহিত্যকর্ম

৮.২ সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের দৃষ্টিকোণ

৮.৩ গঙ্গা উপন্যাস ও লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা

৮.৪ অনুশীলনী

৮.৫ গ্রন্থপঞ্জি

৮.১ সমরেশ বসু- জীবনদৃষ্টি ও সাহিত্যকর্ম

সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮) প্রখ্যাত লেখক, ঔপন্যাসিক। কালকূট ও ভ্রমর তাঁর ছদ্মনাম। তাঁর রচনায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, শ্রমজীবী মানুষের জীবন এবং যৌনতাসহ বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সুনিপুণ বর্ণনা ফুটে ওঠে। ১৯৮০ সালে তিনি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর শৈশব কাটে বাংলাদেশের বিক্রমপুরে আর কৈশোর কাটে কলকাতার উপকণ্ঠে নৈহাটিতে। বিচিত্র সব অভিজ্ঞতায় তাঁর জীবন ছিল পরিপূর্ণ। এক সময় মাথায় ফেরি করে ডিম বেচতেন। বিচিত্র বিষয় এবং আঙ্গিকে নিত্য ও আমৃত্যু ক্রিয়াশীল লেখকের নাম সমরেশ বসু। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত তিনি ইছাপুরের গান ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন। ট্রেড ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টির এক জন সক্রিয় সদস্য ছিলেন তিনি। এ কারণে তাঁকে ১৯৪৯-৫০ সালে জেলও খাটতে হয়। তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘উত্তরঙ্গ’ রচনা করেন জেলখানায়। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি লেখালেখিকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। কালকূট মানে তীব্র বিষ। এটি তাঁর ছদ্মনাম। 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে', 'কোথায় পাব তারে' সহ অনেক উপন্যাস তিনি এ নামে লিখেছেন। তাঁর লেখা ছোট গল্পের সংখ্যা ২০০ এবং উপন্যাসের সংখ্যা ১০০। সমরেশ বসুর জীবনের শেষ দিকের কিছু দিন আমার

জীবনের পরম প্রাপ্তি। কোনও এক অজানা কারণে এই তৃতীয় সন্তানটিকে কৃতজ্ঞ করতেই বুঝি খ্যাতনামা মানুষটি আমাদের কাছে থাকতে এসেছিলেন। বাবা হিসেবে তাঁর সঙ্গে আমার কোনও দিনই আদিখ্যেতা মেশানো মাখোমাখো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। বাবা-মা'র চরম দারিদ্র্য আর কষ্টের জীবনের চারটি খুদে সহযাত্রী ছিলাম আমরা চার ভাইবোন। কেমন ছিল সেই সব দিন!

উত্তর ২৪ পরগনার শ্যামনগর এবং জগদ্দলের মধ্যবর্তী গঞ্জ এলাকা, আতপুর। একটি আধা বস্তির দেড় কামরা টালির চালের নীচে আমাদের ছ'টি প্রাণীর বসবাস। ঘরের চেয়ে বাইরে-বাইরে ঘুরে বেড়ানোতেই আমরা স্বচ্ছন্দ বোধ করতাম। কেননা টালির ঘরের ফাটা মেঝের উপর জলচৌকি রেখে দোয়াতে ডোবানো কলম দিয়ে বাবা লিখতেন। ঘরের উলটো দিকে একফালি খোলা বারান্দায় তোলা উনুনে (ভাঙা বালতির উপর মাটি লেপে বানানো) মা গৌরী বসু, রান্না করতেন। মাঝে মাঝে দু'-চার পাতা লেখা কাগজ নিয়ে বাবা উঠে যেতেন মা'র কাছে। উবু হয়ে বসে, লেখা পড়ে শোনাতেন মাকে। মা মতামত দিতেন লেখা শুনে। কেন জানি না, এই দৃশ্যটি আমার চোখে যেন মহৎ ছবি হয়ে আছে। মা আমাদের মাঝেমধ্যেই স্মরণ করিয়ে দিতেন, "তোদের বাবা একজন লেখক।" কিন্তু লেখক কী বস্তু! আমার সেই ছোট বয়সে কোনও ধারণা ছিল না এই 'লেখক' শব্দটি সম্পর্কে। অথচ বাবার সেই পরিচয় দিতে গিয়ে মায়ের চোখেমুখে একটা গৌরবের আলো যাতায়াত করত। এখন কেন যেন মনে হয়, আমার অবচেতন মনে সেই গৌরবের আলোর প্রতিফলন ঘটেছিল। পরবর্তী কালে, হয়তো সেই আলোতেই আমি ব্যক্তি ও লেখক সমরেশ বসুকে একটু একটু করে আবিষ্কার করেছিলাম, আবিষ্কার করেছিলাম আমার বাবাকে।

আতপুর থেকে নৈহাটিতে চলে এলাম আমরা। জীবনের পরিবর্তন এল। মনে আছে, আমরা নৈহাটিতে চলে আসার কিছু দিন পরেই 'পথের পাঁচালি' সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছিল নৈহাটি সিনেমা হলে। বাবা তখন মোটামুটি পরিচিত মানুষ। বাবার লেখা 'গঙ্গা' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে। 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' ছবি করার জন্য সেই সময়ের বম্বের চিত্রপরিচালক বিমল রায় চিত্রস্বত্ব কিনেছেন। আমাদের জীবন যাপনে

তখনও এমন কিছু পরিবর্তন ঘটেনি। এখনও মনে পড়ে, মা যেন সেই সময় থেকেই একেবারে দশভুজা হয়ে (নামেও তো গৌরী) সংসারটির হাল ধরেছিলেন। যার পিছনে একটাই উদ্দেশ্য, 'ও মানুষটাকে শুধু লেখা ছাড়া আর কোনও ব্যাপারে না-টানা।' রাজনৈতিক বন্দি হিসাবে জেল থেকে ফিরে এসে যখন 'ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরি'র চাকরিটি খোয়ালেন, তখন চারটি শিশুসন্তান থাকা সত্ত্বেও মা বাবাকে বলেছিলেন, "যা হওয়ার হবে, কিন্তু তুমি আর চাকরি করতে যেও না।" ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়! চাল নেই, চুলো নেই, চাকরি নেই, ছ'জনের সংসার, তার মধ্যে চারটি কচি ক্ষুধার্ত মুখ সব সময়ে হাঁ-করে রয়েছে। এরই মাঝখানে একজন স্ত্রী তার স্বামীকে বলছেন, "তুমি লেখো! চাকরি করতে হবে না!" পাগলামি না কি আত্মবিশ্বাস! ভালবাসা না কি মরণঝাঁপ! জায়া-জননী-বন্ধু-কমরেড, কে এমন ভাবে পাশে দাঁড়ায়!

সমরেশ বসু কিন্তু আর ফিরে দেখেননি। ফিরে দেখার সময় তাঁর ছিল না। ছিল শুধু কয়েকজন সহৃদয় বন্ধু। কেউ পুরনো জামাকাপড় এনে দিতেন ছেলেমেয়ের জন্য। কেউ কলাটা-মুলোটা দিয়ে যেতেন। গ্রাম্য গোয়ালা মাকে বলেছিলেন, "পয়সা দিতে পারবে না বলে বাচ্চাদের দুধ বন্ধ করে দেব! অত অভাব আমার এখনও হয়নি! দুধ দেওয়া আমি বন্ধ করব না। যে দিন পয়সা হবে, সে দিনই দিও।" মা গান শেখাতেন। জামাকাপড় সেলাই করতেন। দেশভাগের পর মুসলমান পরিবারের পরিত্যক্ত টালির চালের দু'কামরা ঘরের একটিতে সংসার। দ্বিতীয় কামরাটি মা পুরো ছেড়ে দিয়েছিলেন বাবাকে। 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মানুষটা সারা দিন লেখে' সেই জন্য। সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে মা তখন রীতিমতো পরিচিত মফস্‌সল অঞ্চলে। আমার মনে আছে, নৈহাটির বাড়িতে যে-ঘরে বসে বাবা লিখতেন, তার মেঝে ফুঁড়ে টালির চালের গোল ফাঁক দিয়ে উঠে গিয়েছে এক সুদীর্ঘ নারকেলগাছ। ও ভাবেই তৈরি সেই বাড়ি। অতীতে ওই অঞ্চলের নাম ছিল নারকেলবাগান। ঘর ঘেঁষা ঝোপ-জঙ্গল আর এঁদো পোড়ো জমি মিলিয়ে ছিল কাঠা তিনেক। ওই টালির ঘরের মধ্যেই দেখেছি, বাবার উপন্যাস 'গঙ্গা' নিয়ে নির্মিত ছবির ইউনিট চলে এসেছে। ত্রিবেণীতে আউটডোর করতে এসে ওঁরা চলে এসেছিলেন আমাদের বাড়ি। স্ক্রিপ্ট পড়া হল। রাজেন তরফদার, দীনেন গুপ্ত, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, রুমা গুহঠাকুরতা, নিরঞ্জন রায়, সলিল চৌধুরী, সীতা

মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সংলাপ বলছেন আর বাবা নিজে তাঁদের উচ্চারণ ঠিক করে দিচ্ছেন। সলিল চৌধুরী হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইতে লাগলেন, মা-এসে গলা মিলিয়েছিলেন। হঠাৎ আকাশে কালো মেঘ। মুহূর্তে পরিচালক রাজেন তরফদারের নির্দেশে সকলে ছুটলেন ন্যাচারাল পরিবেশে, আলো-মেঘ-বৃষ্টিতে শ্যুট করতে। বাবাও ছুটলেন ধুতিতে মালকোঁচা মেরে। এখনও যেন কানে শুনতে পাই, বাবা মাকে চেঁচিয়ে বলছেন, ‘‘বুড়ি, (মায়ের ডাকনাম) আমিও যাচ্ছি। কখন ফিরব জানি না, চিন্তা কোরো না।’’ আমরা তখন নেহাতই ছোট, কিন্তু বিপুল উৎসাহে সব দেখছি, আত্মস্থ করে ফেলছি। সমরেশ বসুর জীবননদী বয়ে চলেছিল জোয়ার-ভাঁটায়। পড়েছে বাঁকের মুখেও। কিন্তু থেমে যায়নি। উত্তরোত্তর গতিও সঞ্চারিত হয়েছিল। না, তৎকালীন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি আর প্রতিভাবান এই লেখকের পাশে দাঁড়ায়নি। তাঁর কলমের উষ্ণতা পার্টি ব্যবহার করতে চেয়েছিল রাজনৈতিক প্রয়োজনে। কিন্তু তাঁর সংসারটি কী ভাবে টিকে থাকবে, তার কোনও হদিশ দেয়নি দল। দিশাহারার মতো লেখক পৌঁছে গিয়েছিলেন, আনন্দবাজার পত্রিকার কানাইলাল সরকার, সাগরময় ঘোষের কাছে। সূচনা হয়েছিল জীবনভর সম্পর্কের বাঁধনের। কমিউনিস্ট পার্টি পরবর্তী কালে আজীবন বিদ্রুপ করেছে এবং নেতিবাচক সমালোচনা করেছে সমরেশ বসুর। এমনকী মৃত্যুর পরেও তৎকালীন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ‘লেখকের দ্বিতীয় মৃত্যু’ বলে করে পার্টির কাগজে দীর্ঘ নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। অথচ ছোটবেলা থেকেই দেখেছি, নৈহাটিতে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা বাড়িতে আসতেন নিয়মিত এবং বাবা-মা দু’জনেই যথেষ্ট চাঁদা দিতেন তাঁদের!

মানুষটার ব্যক্তিজীবনেও পরিবর্তন হতে শুরু করেছিল। বদল তো স্বাভাবিক। পরিবর্তন যে প্রকৃতিরই নিয়ম। সমরেশ বসু ব্যক্তি এবং লেখক, উভয় দিক দিয়েই যে ব্যতিক্রমী সন্দেহ নেই। তা ছাড়াও কোথায় যেন এক বিপরীতধর্মিতার জটিল রসায়ন, যাকে হয়তো প্যারাডক্সিক্যাল ইমোশন বলা যায়, ক্রিয়াশীল হয়ে উঠতে শুরু করেছিল মানুষটার মধ্যে। সাহিত্যে যাঁর কোনও ফাঁকি নেই, জীবনে তাঁর অদৃশ্য ফাঁক রচিত হয়ে যাওয়াই কি নিয়তি! না, রচিত তো হয়ে যায় না, রচনা করা হয় বলেই রচিত হয়। এই রচনাই কি মনস্তত্ত্বের জটিল রসায়ন? আপাতদৃষ্টিতে যে আচরণ বা সম্পর্কের

কোনও ব্যাখ্যা মেলে না, মনে হয় চূড়ান্ত বৈপরীত্যে ভরা, অথচ সে দিকেই তীব্র গোপন আনুগত্যের আশ্লিষ্ট হয়ে যাওয়া...কী জানি, বারবার নানা ভাবে, তলিয়ে ভাবার চেষ্টা করেও মনে হয়েছে, সমরেশ বসুর জীবনকাহিনিতে সে যেন এক বিস্মিত বিভ্রান্ত অধ্যায়। জীবনশিকারি লেখক তিনি, নিজেকে সে ভাবেই চিনিয়ে দিয়েছেন, বলেছেন, ‘‘সাহিত্যের থেকে জীবন বড়।’’ সেই মানুষই কবুল করেছেন, ‘‘কাঠ খেয়েছি, আংরা বেরুবে।’’ কোথাও অনুতাপ ছিল কি? বা কিঞ্চিৎ আত্ম-তিরস্কার? হ্যাঁ, তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন ও বাস্তববাদী, আত্মবিশ্বাসী লেখকটির আরও একটি সম্পর্কে ভেসে যাওয়ার অপরিণামদর্শিতার অধ্যায় সেটি। সম্পর্ক-রচনার পাত্রীটির সঙ্গে তাঁর তো রুচি-সংস্কৃতি-বুদ্ধিমত্তা কোনও কিছুরই মিল ছিল না। অথচ নিশির ডাকের মতো টানে ষাটের দশকে নিত্য ছুটে যেতেন পূর্ব কাঁঠালপাড়ার সেই বাড়িতে। যেখানে থমথম করত এক মধ্যযুগীয় পরিবেশ। বড় দালানকোঠা, ছাদে কড়িবরগা, জানালায় খড়খড়ি, ছাদ থেকে জলনিকাশির বাঘমুখ নালা, বড় ইঁদারা, ফাটা চাতাল... আমাদের মামার বাড়ির সেই নিঝুম পরিবেশে খ্যাতিমান লেখকটি ছুটে যেতেন, একমাত্র একটি যুবতীর আকর্ষণে! যে আকর্ষণে ধারাবাহিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তাঁর পুত্র-কন্যারা। অসম্মানে, গ্লানিতে বিধ্বস্ত-ছারখার-ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর সেই ‘বুড়ি’! একটা গোলমাল বিভ্রান্তি লেগেই থাকে। অথচ দিন যায় তার পরেও। লেখকের খ্যাতি-সুনাম-স্বাচ্ছন্দ্য... কোনও কিছুই পড়ে থাকে না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। মানুষটা যেন পাঁকাল মাছের মতো। কাদা-পাঁকের মধ্য দিয়ে চললেও, তাঁর গায়ে আলোর ঝলকানি। ছেলে-মেয়ে স্ত্রীকে ফেলে পাতলেন কলকাতায় নতুন সংসার, দ্বিতীয়া স্ত্রী। স্বচ্ছলতা। অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে আর একটি সন্তানলাভ! বাবা কিন্তু তখনও নিয়ম করে প্রতি সপ্তাহে নৈহাটি যেতেন। তাঁর উপস্থিতিতে প্রাণময় হয়ে উঠত বাড়ির পরিবেশ। সান্ধ্য আড্ডা বসত দোতলায় বাবার ঘরে। কোনও সময় শামিল হয়েছি সেই আড্ডায়। নৈহাটি-ভাটপাড়া-হালিশহর-কাঁচড়াপাড়ার সমরেশ-ভক্তরা এসে জুটতেন আমাদের বাড়িতে। কোনও সময় বাবা-মা দু’জনে বসে কথা বলতেন। গৌরী বসু তার মধ্যেও খেয়াল করতেন, লেখকের চোখেমুখে পরিশ্রমের ছাপ। মানুষটার বয়সও তো বসে নেই! আমাকে বলতেন, ‘‘খুব ধকল যাচ্ছে লোকটার!’’ আর কী আশ্চর্য, তার মধ্যেই

ঝলসে ওঠার মতো গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনি, গোয়েন্দা কাহিনি, কিশোর কাহিনি লিখছেন। ‘দেশ’-এ ধারাবাহিক ‘কোথায় পাব তারে’ ‘যুগ যুগ জিয়ে’ লিখেছেন। ‘বিবর’ পর্যায়ের পরে নক্ষত্রের মতো রচনা ‘বাথান’, ‘টানাপোড়েন’, ‘তিন পুরুষ’, ‘শিকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে’, ‘মহাকালের রথের ঘোড়া’। কালকূট ঝুঁকেছেন মানস ভ্রমণের দিকে: ‘পৃথা’, ‘জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য’, ‘শাম্ব’...

ব্যতিক্রমী মানুষ ও লেখক সমরেশ বসু প্রয়াত হলেন ১২ মার্চ, ১৯৮৮ সালে। তাঁর লেখনী থেমে গেল যাত্রা অসম্পূর্ণ রেখেই। কিছু করার নেই। স্বয়ং বিধাতার সৃষ্টিও তো অসম্পূর্ণ। তবুও কালের বিচারে কিছু স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় তাঁর সৃষ্টি-বৈচিত্র নিয়ে। নিরন্তর আলোচনায় ভেসে থাকেন সৃষ্টিকর্তাটিও। এমনকী রয়েছেন মৃত্যুর তিরিশ বছর পরেও!

৮.২ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি সাক্ষাৎকার সমরেশ বসু সম্পর্কে

সমরেশ বসু আমাদের ঠিক এক দশক আগের লেখক। অর্থাৎ আমরা যখন সদ্য স্কুল ছাড়িয়ে তখন তিনি উদীয়মান তরুণ লেখক। 'পরিচয়' কিংবা 'দেশ' ছাড়াও অনেক ছোটখাটো পত্রিকায় তাঁর লেখা বেরুচ্ছে, যতদূর মনে পড়ে তার 'অকালবৃষ্টি' নামে একটি দুর্ধর্ষ ছোটগল্প কোনো ছোট পত্রিকাতেই প্রথম ছাপা হয়েছিল। আমরা তখন কবিতা নিয়ে মাতামাতি করছি, কবিতার পত্রিকা প্রকাশ করছি; কবিরা সাধারণত গদ্য রচনা বিশেষ পড়ে না, কিন্তু আমি সব পত্র-পত্রিকায় প্রতিটি রচনা তন্নতন্ন করে পড়তাম এবং সমরেশ বসুর অগ্রগতি লক্ষ করেছি।

দেশ পত্রিকায় কালকূট নামে ধারাবাহিক উপন্যাস 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' প্রকাশের পরই তরুণ লেখক সমরেশ বসু হয়ে গেলেন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক। তখনকার খুব উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের প্রকাশক সিগনেট প্রেসের দিলীপকুমার গুপ্ত 'বি টি রোডের ধারে' উপন্যাসের লেখককে সোনার কলম পুরস্কার দেবার কথা ঘোষণা করলেন, তারাশঙ্কর থেকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পর্যন্ত খ্যাতনামা লেখকেরা সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। আমাদের মতন কফিহাউসের ছেলে ছোকরারা তাঁকে বরণ করে নিয়েছি আরও

আগেই।কোনো লেখকের রচনা পড়ে মুগ্ধতা জাগলে সেই লেখকের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও জানতে ইচ্ছা করে। সমরেশ বসু সম্পর্কে তখন নানা ধরনের সত্য-মিথ্যা গল্প প্রচলিত ছিল। কফি হাউসের আড্ডায় তিনি বিশেষ আসতেন না কিন্তু কলেজস্ট্রীট পাড়ায় তাঁকে দেখা যেত প্রায়ই। দৈর্ঘ্যে কিছুটা খাটো কিন্তু অত্যন্ত রূপবান পুরুষ। মুখখানি সহাস্য। তাঁর প্রতিদিনের পোশাকই নজরে পড়ার মতন। যদিও তাঁর প্রথম যৌবন বেশ দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে, সেই সময়েও তাঁর অবস্থা তেমন সচ্ছল নয়, কলকাতায় তাঁর কোনো বাসস্থান ছিল না, নৈহাটি থেকে ট্রেনে যাতায়াত করতেন, কিন্তু এক একজন মানুষই থাকে এরকম পোশাকের সুরুচি সম্পর্কে সজাগ। তাঁকে আমি কোনোদিনই ময়লা কিংবা ইস্ত্রি-নষ্ট জামাকাপড় পড়তে দেখিনি, সুদৃশ্য পোশাকে তাকে মানাতোও খুব।১৯৬৫ সালে শারদীয় দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'বিবর'। সঠিক বছরটা মনে থাকার কারণ, পরের বছরই ঐ শারদীয় সংখ্যায় একটি উপন্যাস লিখে আমি অনধিকারীর মতন গদ্যের জগতে অনুপ্রবেশ করেছিলাম। 'বিবর' প্রকাশিত হবার পর সন্তোষকুমার ঘোষ একটা চিঠি লিখে সেই উপন্যাসের অজস্র প্রশংসা করে জানান যে, তাঁর মতে বিবর দশটি শ্রেষ্ঠ বাংলা উপন্যাসের অন্যতম। প্রায় সমসাময়িক কোনো লেখক সম্পর্কে অপর প্রতিষ্ঠিত কোনো লেখকের এরকম লিখিত উচ্ছ্বাস সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। তারপরেই 'বিবর'কে কেন্দ্র করে বিতর্কের ঝড় ওঠে। পরের বছর ‘প্রজাপতি’ প্রকাশিত হলে সেই বিতর্ক অন্যদিকে মোড় নেয়। সাহিত্যে শ্লীল-অশ্লীল বিষয়ে আলোচনা-সভা বসে বহু জায়গায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী, এবং অন্যত্র। কেন জানি না সেই সব সভাতে আমারও ডাক পড়তে লাগলো, সেই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে আমার ব্যাক্তিগত পরিচয়টা জমে ওঠে। যদিও এর আগে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়েছে কয়েকবার, সাগরময় ঘোষের দফতরে, সন্তোষময় ঘোষের ঘরের আড্ডায়। একবার সন্তোষকুমার আমাকে প্রায় জোর করেই সঙ্গে নিয়ে গেছিলেন নৈহাটিতে সমরেশ বসুর বাড়িতে, তাঁর প্রথমা স্ত্রী গৌরীদেবীর একটি সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের সেদিন বার্ষিক উৎসব, সাগরময় ঘোষ, সুচিত্রা মিত্র, প্রমুখ আরও অনেকে গিয়েছিলেন। প্রায় সারারাত খুব হৈ চৈ হয়েছিল।শ্লীল-অশ্লীল আলোচনা-সভাগুলিতে সমরেশ বসু প্রতিপক্ষের আক্রমণের উত্তর দিতেন জোরালো যুক্তি দিয়ে, আমাদের

দেশের নির্যাতিত নিরন্ন মানুষের পোশাক ও মুখের ভাষার উদাহরণ তুলে ধরতেন প্রায়ই। আমি আমার বক্তব্য সেরে দিতাম অনেকটা ঠাট্টা ইয়ার্কি করে। আমার ধারণা, বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত যা লেখা হয়েছে তা নিয়ে অশ্লীলতার প্রসঙ্গই ওঠে না। 'বিবর'' প্রজাপতি'-কে অশ্লীল বলা হলে 'ট্রপিক অফ ক্যানসার'-কে কী আখ্যা দেওয়া হবে? কিন্তু এইসব আলোচনা-সভা এক এক সময় বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠতো, রাজনীতিতে তখন একটা চরমপন্থী হাওয়া বইছে, বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী দু'দিকের রাজনীতিই চলে যাচ্ছে চরমপন্থার দিকে। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, সাহিত্য-সংস্কৃতির নীতিবাগীশতার ব্যাপারে দু'পক্ষই একমত। সমরেশ বসুকে কেউ কেউ শারীরিক আক্রমণেরও ভয় দেখিয়েছিল, কিন্তু তিনি অকুতোভয়, তিনি আবার লিখলেন স্বীকারোক্তি, পাতক।

সেই সভা সমিতি থেকে বেরিয়ে কোথাও কোথাও আমরা বসতাম একসঙ্গে। তাঁর চেনাশোনার পরিধি অনেক বড় হলেও তিনি আকৃষ্ট হলেন আমাদের আড্ডায়। মাঝে মাঝেই চলে আসতেন। একদিন তিনি বলেছিলেন, আপনাদের আড্ডায় পরনিন্দা-পরচর্চা বিশেষ হয় না, এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার! আমাদের আড্ডায় রাজনৈতিক ভেদাভেদও ছিল না, বড় কাগজের লেখক বলে কোনো তফাত ছিল না, আমি নিজেই তখনো প্রধানত ছোট কাগজেরই লেখক এবং একটি ছোট পত্রিকার সম্পাদক। রাত্রের দিকে আমরা দল মিলে তাঁকে পৌঁছে দিতাম শিয়ালদা স্টেশনে, তিনি লাস্ট ট্রেনে নৈহাটি ফিরতেন। কিছুদিন পর তিনি বালিগঞ্জ স্টেশান রোডে একটা ফ্ল্যাট নিলেন, সেটাই হলো কলকাতায় তার প্রথম আস্তানা। দ্বিতীয়া পত্নী ধরিত্রী অর্থাৎ টুনিকে নিয়ে তার ছোট্ট সংসার। সেই প্রথম দেখি একজন বড়ো মাপের লেখকের দৈনন্দিন সাহিত্যচর্চা। প্রত্যেকদিন সকালবেলা নিয়ম করে বসতেন, দুপুরে প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও খালি গায়ে বসে লিখে যাচ্ছেন, কোনো কোনো দিন আড্ডার ঝোঁকে দুপুরের দিকে চলে গেছি তাঁর ওখানে, তিনি খানিকটা অপ্রস্তুতভাবে হেসে বলতেন, এখন যে ভাই লিখছি! অর্থাৎ স্পষ্ট চলে যাবার ইঙ্গিত! লেখাটা যেন তার প্রতিদিনের সাধনা ও যারা অফিসে কাজ করেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে কাজে ফাঁকি দেন, কারণ কাজটা তাদের নিজস্ব নয়। অন্য একজনও সে-কাজ করে দিতে পারে, কিন্তু লেখক-শিল্পী-বৈজ্ঞানিকদের কাজে ফাঁকি দেবার উপায় নেই।অনেকের ধারণা, সাহিত্য রচনা বুঝি

একটা প্রেরণার ব্যাপার। যখন তখন লিখতে বসলেই কি লেখা হয়? লেখা যখন মাথায় আসবে তখনই তো লিখতে বসা হবে। কিন্তু প্রেরণা জিনিসটা ভূতের মতন যখন তখন মাথায় এসে ভর করে না। সাদা পৃষ্ঠার সামনে বসে নিঃশব্দ বন্দনা করতে হয়। লেখকের কাছে যে-কোন রচনার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ হলো প্রথম লাইনটা। কখনো কখনো পথ চলতে চলতে বিদ্যুৎ ঝলকের মত সেই লাইনটা মাথায় আসতে পারে বটে, আবার অনেক সময় হারিয়েও যায়। সাদা পৃষ্ঠাই সেই লাইনটি খুঁজে পাবার প্রধানতম প্রেরণা। সেইজন্যই, প্রতিদিনই লিখতে না পারলেও বড় লেখকেরা নিয়মিত লেখার টেবিলে বসেন, যেমন রবীন্দ্রনাথ লিখতে বসতেন প্রত্যেকদিন ভোরবেলা। সমরেশ বসুকে চোখের সামনে সেরকম একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখেছি।তিনি ঠিকই করে ফেলেছিলেন যে সাহিত্যকেই সম্বল করে কাটিয়ে দেবেন সারাজীবন। কোনো চাকরি বাকরিতে সময় নষ্ট করবেন না। এই সিদ্ধান্ত সঠিক এবং দুঃসাহসিক। গান বাজনা, ছবি আঁকা, সাহিত্যচর্চা এগুলি চব্বিশ ঘন্টারই কাজ, একজন শিল্পীর পক্ষে চুপ করে বসে থাকা বা আপাত আলস্যও খুব প্রয়োজনীয়, কিংবা ভ্রমণ কিংবা অন্য কোনো সখের চর্চা কিন্তু দুঃখের বিষয়, নিছক শিল্প সাহিত্যের জন্য নিবেদিত হলে এদেশে জীবিকা অর্জন করা যায় না। চিত্রকর-কে নিযুক্ত হতে হয় ওষুধ কম্পানিতে।কবিকে সংবাদপত্র অফিসে কলম ক্ষইয়ে দিতে হয়, দেবব্রত বিশ্বাসের মতন গায়ককে আমি দেখেছি ইনসিয়রেন্স কম্পানির অফিসে হিসাবপত্তর দেখাশুনার চাকরিতে। পুরোপুরি সাংসারিক দ্বায়িত্ব নিয়েও শুধু বাংলা লিখে জীবনযাপনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন একসময়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের চোখে দেখা সময়ে সমরেশ বসু। আমাদের সঙ্গে যখন পরিচয়, তখনও সমরেশ দারিদ্র্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছেন। সেইজন্য তাঁকে লিখতে হয়েছে প্রচুর, স্বনামেই এবং কালকূট নামে ছাড়াও ভ্রমর ছদ্মনামেও তিনি লিখেছেন প্রচুর, সব লেখাই যে উৎকৃষ্ট হয়েছে তা বলা যায় না, এত লিখলে তা সম্ভবও নয়। আমাদের দেশে সমালোচকরা এমনই অদ্ভুত, একজন লেখকের দশটা লেখার মধ্যে যদি চারটে খুব ভালো হয়, তিনটে মাঝারি আর তিনটে নিরেস, তা হলে সমালোচকরা প্রথম চারটি উপেক্ষা করে শেষের তিনটি নিয়েই হুল্লোড় করেন। সমরেশ এইসব সমালোচকদের কখনো গ্রাহ্য করেননি। তার চেয়েও বড় কথা, যাকে এত লিখতে হয়,

সেই লেখকও প্রত্যেক বছরই বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কিছু লেখার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছেন এবং সার্থক হয়েছেন।জীবনযাপনের জন্য এত বেশী লিখতে হলেও তিনি কখনো দাঁতে দাঁত চেপে লেখেননি। তাঁর কমিটমেন্ট ছিল নিজের কাছে, মহাকালের দিকে তিনি অবহেলার সঙ্গে টুসকি মেরেছেন। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করার পরে সন্ধ্যেবেলা তিনি অন্য মানুষ। আমি যতদূর জানি, পারতপক্ষে তিনি সন্ধ্যের পর কলম ধরতেন না। শুনেছি সম্পূর্ণ মহাভারতের বঙ্গানুবাদক এবং টীকাকার হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মশাইও সূর্যাস্তের পর মানুষের মেধাও ঢলে পড়ে মনে করে সন্ধ্যের পর কিছু লিখতেন না। নৈহাটির কায়স্থ ঔপন্যাসিকটিও এইদিক থেকে ছিলেন প্রাচীন ব্রাহ্মণদের অনুসারী। সন্ধ্যের পর সমরেশ বসু ছিলেন অন্য মানুষ। সেজেগুজে বেরুতেন, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেবার জন্য তার প্রাণ আনচান করতো, আড্ডার সঙ্গে সঙ্গে হাসি -ঠাট্টা, তর্কাতর্কি, গান, কখনো কখনো নাচও। টপ্পা অঙ্গের পুরোনো বাংলা গান ও রবীন্দ্রসঙ্গীতে তিনি পারঙ্গম ছিলেন, খুব ফুর্তি হলে দু'একটা লৌকিকনৃত্যেও মেতে উঠতেন। কোনো সন্ধ্যায় উনি চুপচাপ বাড়ি বসে থাকলে ওঁর স্ত্রী টুনি ভয় পেয়ে যেতেন। তাহলে কি মানুষটার অসুখ বিসুখ হলো নাকি?বাংলাদেশ যুদ্ধের বছরে আমরা সবাই উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিলাম। সেই যুদ্ধের শেষের দিকে আমরা উত্তেজনার আতিশয্যে সংবাদপত্র অফিসে রাত্রি ভোর করেছি। সংবাদপত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও সমরেশ বসুও আসতেন, তাঁর জন্ম পূর্ববাংলা, শৈশব কেটেছে ঢাকা শহরে, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে

তিনি দারুণ আগ্রহী ছিলেন। তারপর আমরা সদলবলে গেলাম স্বাধীন বাংলাদেশে, সেখানে পেয়েছি সমরেশ বসুর প্রবল যৌবনময় সান্নিধ্য। তখন বাংলা সাহিত্যে কোন রাজা-বাদশা নেই। সমরেশ বসুকেই মনে হত যুবরাজ। দু'দিকের বাংলা সাহিত্য অনুরাগীদেরই তিনি পরম প্রিয়। যিনি 'কোথায় পাবো তারে' লিখছেন, তিনিই লিখছেন ‘গঙ্গা’, 'মানুষ রতন' কিংবা 'পাড়ি'-এর মতন গল্প তিনি অবহেলায় লিখে ফেলছেন এ-ক’দিনে।

এর কয়েকবছর পর, আমরা যখন কবিতার 'কৃত্তিবাস' পত্রিকাটিকে সব-মেলানো মাসিক কবিতা-গদ্যের রূপ দেবার চেষ্টা করছি, তখন তিনি নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বললেন, আমি এই কাগজে ধারাবাহিক উপন্যাস লিখবো। আমাদের সেই অব্যবসায়ীক পত্রিকায় টাকা পয়সা দেবার কোনো প্রশ্ন ছিল না। আর সেই সময়ে সমরেশ বসু প্রত্যেক জনপ্রিয় পত্র-পত্রিকায় অতি আরাধনীয় লেখক, অনেকেই তাঁর লেখা সাধ্যসাধনা করেও পায় না, তবু তিনি কৃত্তিবাসে নিজের থেকে লিখতে চেয়েছিলেন এবং যথাসময়ে ইনস্টলমেন্ট দিতেন।

৮.৩ গঙ্গা উপন্যাস ও লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা

গঙ্গা' উপন্যাসটি দিয়েই সুনামের চরম শীর্ষে পৌঁছে গেছেন, 'গঙ্গা' মূলত লড়াই করে বেঁচে থাকারই কাহিনীমালা। প্রকৃতি এবং মানুষের সঙ্গেই মানুষকে লড়াই করে বেঁচে থাকার নামই যে জীবন, সেই কথায় বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়। পাঠক বিলাসের সাহসিকতা আর উদ্দামতা দেখে শিহরিত না হলেও তার সমুদ্রে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা অনেকটা সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা জাগায়। একজন সামান্য মাছমারা ধীবর হয়ে তার মধ্যে যে আগুন তার খুড়ো পাঁচু লক্ষ্য করে তা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। হতদরিদ্র মাছমারারা কখনো সুখে-শান্তিতে থাকতে পারেনি, তাদের জীবনটাই চলমান নদীর মতো, কোথায় যে সুখের ঠিকানা, আর কোথায় বা গঙ্গার কৃপা, তারা জানে না। দাদন ব্যবসাদের রক্তচক্ষু, আর মহাজনদের চড়া সুদে টাকা ধার এবং ফড়েনিদের হুকুমজারি, অল্প দামে মাছ কিনে নেয়ার ছলনা, সবই তাদের বিপক্ষে যায়, তারা শুধু অন্ধকারেই রয়ে যায়। ঘরে মা-বাবা স্ত্রী-সন্তান হা-হাপিত্তাস করে বসে আছে, ঘরের মানুষ অকুল দরিয়ায় জীবন বাঁচানোর ফসল তুলতে গেছে, ঘুম কি আসে কারো চোখে। হাজারো চিন্তায় মনপ্রাণ উথালপাথাল।এভাবেই জীবনটা চলে ধুকে-ধুকে, মালোপাড়ার মানুষের জীবনগুলো যেন বিধাতা এভাবেই গড়ে তুলেছে, যার কারণে রোগ-শোক চিরসঙ্গি। মৃত্যু যেন কাছের পড়শি, আর তাই দেখা যায় 'গঙ্গা'র মূলচেতনা নদীর প্রতিকূলতার সঙ্গে জড়িত মৃত্যুবোধ। মানুষ-প্রকৃতি-পরিবেশ-নদী এই উপন্যাসের প্রধান বিষয়বস্তু। সমরেশ বসু বিশেষ একটি অঞ্চলের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের

জীবনযাত্রার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করেছেন। নদীই হলো উপন্যাসের সক্রিয় এবং আচরণশীল।খুড়োর বারণ সত্ত্বেও বিলাস মনেপ্রাণে ভালোবেসে ফেলে দামিনি ফড়েনির নাতনি প্রেমিক পরিত্যক্ত হিমিকে, এই হিমিই তার জীবনটাকে একটা স্থিতি জায়গায় এনে পরিবর্তনসাধিত করে, পতিতাপল্লীর মেয়ে এবং যার মা ছিল রাড়ি অর্থাৎ পতিতা, সেই মেয়েটাই বিলাসকে নতুন দিনের স্বপ্ন দেখায়, সমুদ্রে যাওয়ার প্রেরণা জোগায়, এমন কি সমুদ্রধীবরের বউ হওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে।বিলাসের চরিত্রের মধ্যদিয়ে সমরেশ বসু নিজেকে বিশাল একটা জায়গায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কারণ গঙ্গা থেকে সমুদ্রে যাওয়ার যে কাকুতি দেখতে পাওয়া যায় তা সত্যি অপূর্ব বলতেই হয়। বিলাসকে শুধুমাত্র গঙ্গা ধরে রাখতে পারেনি, পারার কথাও নয়, কারণ যার কানে সমুদ্রের ডাক পৌঁছে সে কি আর বদ্ধ স্থানে পড়ে থাকে, তাই দেখা যায়, বিলাসের মন অস্থির সর্বসময়,শহরঘেঁষা গঙ্গা, শহরের নানান লোভনীয় হাতছানি তাকে কিছুতেই বশ করতে পারেনি। বিলাসের দুঃসাহস দেখে কখনো খুড়ো পাঁচু অবাক হয়েছে, খিস্তি-খেউড় করেছে, কিন্তু কোনোভাবে দমাতে পারেনি, কারণ সে জানে ওর রক্ত নিবারণ সাঁইদারের রক্ত, সেই দুঃসাহসিক মানুষটা যেমন ছিলেন গুণিন তেমনি ছিলেন সমুদ্রের বাছাড়ি নৌকার মাঝি, একত্রিশ হাত বাছাড়ি নৌকা নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতো, কয়েকবার পাঁচুও সঙ্গি ছিল বড়দার, সেই দাদার আগুন ভাইপো বিলাসের মধ্যে দেখতে পেয়ে মনে মনে শিহরিত হলেও গর্বে বুক ভরে যেতো।সমরেশ বসুর জীবন ছিল ‘গঙ্গা’র মতো, বারবার কুল ভেঙে-ভেঙে সামনে যেতে চেয়েছেন, কিন্তু বারবারই ব্যর্থ হয়েছেন, যে ‘গঙ্গা’ তার চেতনার আর উপলব্ধির পাড় ভেঙেছে বারবার, এই গঙ্গা আক্ষরিক অর্থে নদী নয়, জীবন-মহাজীবন, শুধু জীবনই বা বলি কেনো ‘সময়’, নদী চলেছে সমুদ্রে, সময়ও। অতীত থেকে ভবিষ্যতের অকুল দরিয়ায়। আজ কাল পরশুর বাঁক ছাড়িয়ে চিরকালের বা মহাকালের দিকে, মহাকাল সে তো সুদূরদিগন্তে, অসীমের মাঝে হারিয়ে নিজেকে খুঁজে ফেরা, এই জীবন চেতনার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছে মৃত্যুচেতনা।সমরেশ তার রচনায় বিষয় ও ক্ষেত্র বা আঙ্গিক পরিবর্তন করেন, ফিরে এলেন সমতলের গঙ্গায়। ধীবর বা মালোদের জীবনের বিচিত্র কাহিনীতে, নদী থেকে সমুদ্রে যার বিস্তার, এই পৃথিবীর আদিম এক শিকারী সমাজ যাদের জীবনের সিকি

ভাগ ডাঙায় আর বাকি তিন সিকি ভাগই পড়ে থাকে জলে, মাছেদের সাথে, নদী এসেছে তার জীবনে সর্বনাশা কুলত্যাগিনী নারীর অনিবার্য রুপকে, জলের ঋতু বদলায়, প্রহরে-প্রহরে রঙ বদল হয়, তার অদৃশ্য অজানা গর্ভে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে দেখা দেয় জলের শস্য, জীবনের ফসল। সেখানে ঝরা-খরা ও মরার ত্রিমিতি, মিঠে জলে মেশে জীবনের লবণ। এই মানুষগুলোর দিবারাত্রির বারামাস্যায় ছায়া ফেলে অসংখ্য জীবাশ্মঘটিত জটিল সংস্কার আর কিংবদন্তির গল্পমালা। জীবিকা হয়ে ওঠে জীবনের নেশা। নিয়তির মতো নিষ্ঠুর উদাসীন প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষানুক্রমে দ্বন্দ্ব পুরুষানুক্রমে তা নাটকীয়রূপ নিয়েছে মাছমারাদের জীবনে।এই মাছমারাদের হালে-জালে হাত রেখে তিনি তাদের নাড়ির স্পন্দন অনুভব করেছেন, যেন মুখোমুখি বসে একই বিড়ির আগুনে গল্প ধরিয়েছেন, এই অন্তরঙ্গতাই যুগিয়েছে গঙ্গা উপন্যাসের উপকরণ। তার চাল-চরিত্র এবং চালচিত্র। গাবে মজানো জালের মতোই গল্পের রসে আঁচিয়ে এর ক্যানভাসটা ছড়িয়ে পেতেছিলেন সমরেশ, প্রবল জলস্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছিলো এর ভাটিয়াল কাহিনী, বর্ণবহুল ঘটনায় ছলাৎ ছলাৎ দাঁড়টানার শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছিলো থেকে-থেকে, সে সঙ্গে আরো একটা বাড়তি পাওনা, সব ছাড়িয়ে আবেগ, অন্যরকম জলের টানের মতোই ভাষায়। তবে গঙ্গা উপন্যাসটি শহরঘেঁষা বলা যেতে পারে, চরিত্রের অনুষঙ্গে, কাহিনীর দাবিতে গঙ্গা'য় বসিরহাট-ত্রিবেণী-নৈহাটি-হুগলী-ক্যানিং-হাসনাবাদ এবং চন্দননগরের মতো বেশ কিছু অঞ্চলের কথা উল্লেখিত হয়েছে, এসব অঞ্চলের বাতাবরণ শহরঘেঁষা। তবে উপন্যাসের ভূমিকায়, সমরেশ বসু লিখেছেন, আতপুর ও হালিশহরের মৎস্যজীবীদের সহযোগিতা না পেলে 'গঙ্গা' লেখা সম্ভব হতো না। উপন্যাসটি লেখার আগে অনেক মালো পরিবারের সঙ্গে দিনরাত্রি গঙ্গাবক্ষে কাটিয়েছেন তিনি।

৮.৪ অনুশীলনী

১) সমরেশ বসুর সাহিত্যজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২) সমরেশ বসুর সৃজন প্রতিভার সঙ্গে ওনার জীবন কেমন করে সংপৃক্ত হয়ে ছিল তার পরিচয় কেমন করে পাওয়া যায়।

মন্তব্য

৩) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে কেমন করে দেখা যায় লেখককে? পরিচয় দাও।

৮.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১) গঙ্গা সমরেশ বসু – মৌসুমী পাবলিকেশন।

২) বাংলা সাহিত্য পরিচয়, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তুলসী প্রকাশন।

৩) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দেবেশ কুমার আচার্য, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি।

একক – ৯ গঙ্গা উপন্যাসের কাহিনিচিত্রণ

বিন্যাস ক্রম

৯.১ গঙ্গা উপন্যাসের কাহিনিচিত্রণ

৯.২ গঙ্গা উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা

৯.৩ জলকেন্দ্রিক উপন্যাসের সঙ্গে সমরেশ বসুর গঙ্গার সংযোগ

৯.৪ অনুশীলনী

৯.৫ গ্রন্থপঞ্জি

৯.১ গঙ্গা উপন্যাসের কাহিনিচিত্রণ

বড় প্রেম যে সবসময় কাছেই টানে না, অনেক সময় দূরেও সরিয়ে দেয়। গঙ্গা'র বিলাস-হিমির প্রেমের চিত্রটি একইভাবে অঙ্কিত হয়েছে। বিলাস ফিরে গেছে ধলতিতার দিকে, এখানে একটু নাটকীয়তা লক্ষ্য করা গেলেও ভালোবাসা সব সময়ই সুন্দর তা চিত্রায়িত করেছেন সমরেশ। জেলে জীবন মূলত গ্রামনির্ভর, গঙ্গা উপন্যাসে ধীবরদের গ্রামভিত্তিক সমাজজীবনের পরিচয় খুব একটা অঙ্কিত হয়নি, মালোদের স্থলজীবনের ছবি অল্প পরিসরে এসেছে, তাদের জলজ জীবনের বৈচিত্র্যই এখানে বিস্তৃতভাবে পরিলক্ষিত, নৌকার ওপরে কি ভাবে জীবন অতিবাহিত হয় তা দেখানো হয়েছে, তারপরও বিলাসের প্রথম যৌবনের টুকরো-টাকরা কিছু ছবির দৃশ্যাবলী আলোকপাত করা হয়েছে, যেমন কোনো এক উদভ্রান্ত দুপুরে অমৃতের তন্বী বউয়ের শরীরের ভাজে নিজের পুরুষত্বকে সমর্পণ করেছিল বিলাস, তারপর থেকে ওর ভেতরে একটা চনমনে ভাব লক্ষ্য করা যায়। রমণীয় সুখ বা নেশা হয়তো একেই বলে, নিজেকে আর নিজের আয়ত্বের মধ্যে রাখতে পারেনি, সেই সুখের নেশা বুকে নিয়ে খুড়ো পাঁচুর সঙ্গে গঙ্গায় মাছ মারতে এসেছে বিলাস। তবে পাঁচু প্রত্যক্ষ করেছে, নিবারণের মতোই বিলাস দুর্বিনীত এবং স্পষ্টভাষী, কারো কথায় পরোয়া করে না, হিরো হওয়ার জন্য নয়,

অন্যায় সহ্য করতে পারে না, তবে নিবারণ জাত মাছমারা হলেও যেদিন অন্যের ঘের থেকে মাছ চুরি করতো, সেদিনই হাতে কিছু পয়সা থাকতো, সেদিন বাজারে গিয়ে মদ খেতো এবং পতিতাপল্লীতে গিয়ে শরীর ও মনটাকে কিছুসময়ের জন্য তৃপ্ত করে ফিরতো, অথচ বিলাস মদ খায় না, যদিও দামিনী তাকে জোড় করে একবার খাইয়ে দিয়েছিল, তবে নারী শরীরের প্রতি একধরনের আস্বস্তি পুরোদস্তুর ছিল, সেই লোলুপতা থেকে একরকম ভালোবাসা বাসা বাঁধে মনের কোণে, হিমিই প্রকৃতপক্ষে নায়িকা বলা অপেক্ষা রাখে না।উপন্যাসে চরিত্র অনেক থাকলেও খুড়ো পাঁচু-বিলাস হিমি-দামিনী ঘুরেফিরে মূখ্যভাবে এসেছে, এদের জীবন নাটকই উপন্যাসের প্রাণ, নদীর মতো এগিয়ে গেছে বাঁকে, কোথাও থেমে থাকেনি, গঙ্গা' যেন মহাভারতের সেই পবিত্র গঙ্গা। গঙ্গায় গোষ্ঠীবদ্ধ জেলেজীবনের নানা প্রসঙ্গে মিথ-পুরানের কথা যেমন এসেছে, লৌকিক-অলৌকিক অনেক সংস্কার আছে, পৌরাণিক চরিত্রেরা কদাচিৎ জেলেদের সংলাপে আবার কখনো মালোসমাজের বর্ণনায় ছুঁয়ে গেছে, শান্তনু-গঙ্গা, জগন্নাথ ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণ-রাঁধা, কালীডাকিনী-বাসুকি প্রমুখ প্রতীকতায় ধীবরসমাজে লগ্ন হয়ে উঠে এসেছে 'গঙ্গা'য়। দক্ষিণরায় তথা বনবিবিকে জেলের শবর থেকে দূরে থাকার মিনতি জানায়, মাছের দেবতা খোকাঠাকুরকে উদ্দেশ্য করে জেলেবউয়ের কাতর আকুতি, 'তুমিই মাছমারার দ-মু-এর কর্তা, তুমি দিলে আমি আমার সোয়ামির হাসিমুখ দেখবো, ঘরে আমার সোহাগের বান ডাকবে, আমার ছায়েরা হেসেখেলে বেড়াবে, আমার হাঁড়ি ভরে থাকবে, নতুন সুতো আসবে, নতুন জাল বুনবো, আমি পুজো দেবো তোমাদের সকলের পায়ে।' মা গঙ্গা কৈবর্তদের পরম আরাধ্য, মাছমারাদের সারাবছরের ভাতকাপড় গঙ্গার কাছেই পাওনা, তাই গঙ্গা'য় প্রার্থনার বিষয়বস্তু, তারই দয়া-দাক্ষিণ্যে ধীবরদের অস্তিত্ব এবং জীবিকার সংস্থান। গঙ্গা জেলেদের একমাত্র ভরসা। তাই বিশ্বাস করে, জীবন-যৌবন, মরণ-টাকাপয়সা-ধনদৌলত বেঁচে থাকার সকল সুখ নিয়ে মা-ঠাকুরুণ বসে আছে গাঙের তলায়। এবং তার কৃপায় বিশ্বসংসার চলে। মা-ঠাকুরুণ সকল সহায়, সে বাঁচতে বলে বাঁচা, মরতে বললে মরা।

নদীতীরের জীবনযাত্রার দৃশ্যবলী বেশ কাব্যময় করে তুলে ধরেছেন, কোথাও কৃত্রিমতা নেই, যেন কলমের আগায় সাবলীল ভাবে তরতর করে বের হয়ে আসছে জীবনের

কথা ও প্রতিচ্ছবি। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ‘গঙ্গা’য় মৎস্যজীবী সমাজের অলৌকিক সংস্কার-বিশ্বাসে আবিষ্ট, নদীসমূহের জোয়ার ভাটা আবর্ত প্রভৃতি প্রকট ও গোপন বিপদের সহিত অবিরত সংগ্রামে প্রতিনিয়ত মৃত্যুরহস্যের সম্মুখীন, জলস্রোত ও মনোস্রোতের বেগবান প্লাবনের মধ্যে অত্যাজ্য সংস্কার পরিণত জীবননীতির নোঙরে দৃঢ়সংবদ্ধ জীবনের অপূর্ব পরিচয়।’সেই মানবিক ভাবনা থেকেই ‘গঙ্গা’ লেখা, সমরেশ বসু নিজেই বলেছেন, ‘উপন্যাসটি এক শিকারের কাহিনী, কিন্তু অলক্ষে চলে গেছে সেই বিবরণের ধারাবাহিকতায়। গঙ্গার বুকে মৎস্যজীবীদের সঙ্গে মাছ মারতে গিয়ে অন্যরকম এক উপলব্ধি জাগে, এবং সেই সময় ‘মাছ ধরা’ শব্দটি বড় বেমানান শোনায়, আর তাই মৎস্যজীবীদের আমিই অভিহিত করেছিলাম ‘মাছমারা’। আনন্দ বাগচীর একটি মন্তব্য, ‘খ- দৃষ্টিতে যে জীবন শুধুই জলের পাঁচালী, লৌকিক মহাকাব্য চাপা পড়ে আছে তারই তলায়। সমরেশ বসুর চোখে অবশ্যই সেটা এড়ায়নি, বহুবার ছুঁয়ে ছেনে-ছেঁদে দেখার মতোই এই নদী আর তার নাব্যজীবন তার অজানা ছিল না। এই মাছমারাদের হালেজালে হাত রেখে তাদের নাড়ির স্পন্দন অনুভব করেছেন...’

নদী আর নারী দুই নিয়তির মতোই সমরেশকে চিরদিন বিপরীত আর্কষণে টেনেছে, নদীকে অবশ্য ব্যাপক অর্থে প্রকাশ করেছেন, জীবন যেখানে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে, সেই জীবনের কথায় নদীর কাছে ব্যক্ত করেছেন কিন্তু নারী সেই জীবনের এবং জীবনবোধেরই জ্বালানি। বারংবার আমরা তাই নদী আর নারীর কাছেই ছুটে আসি, জীবন যে এখানে চিরকালের বাঁধনে বাঁধা।বাংলা সাহিত্যের জমিন সরস করেছে নদী। গানে, গল্পে, কবিতা, উপন্যাসে, সবখানে নদীর আধিপত্য সবার আগে। নদীর উপস্থিতি যতটা মনে ততটা মননে। উপমা, উপমান কিংবা সরাসরি নদী আর বাংলা একাকার। তাছাড়া বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে নদী যতটা জালের মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, অন্য কোথাও তা হয়তো নেই। আর এ কারণে বাঙালির প্রতিটি ক্ষেত্র অর্থাৎ, শিল্প-সাহিত্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য, নগর-জনপদ গড়ে উঠতে নদী বড় ভূমিকা রেখেছে। তাই সংগতভাবেই প্রত্যেক সাহিত্যিকের লেখনীতেও কোনো না কোনোভাবে এসেছে নদীকথন। এর পাড়, বালুচর, জেলে এমনকি বধূর কলসিতে জল তোলার দৃশ্যও বাদ

পড়েনি সাহিত্য-বুননে।বাংলা সাহিত্যে নদী-জীবনকেন্দ্রিক যেসব উপন্যাস প্রাধান্য পেয়েছে তার মধ্যে অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস একটি নদীর নাম, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি, সমরেশ বসুর গঙ্গা, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইছামতি এবং হুমায়ুন কবীরের নদী ও নারী। অবশ্য ইছামতি নদীপারের জীবনকেন্দ্রিক একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনালেখ্য। এখানে তৎকালীন সময়ের নদী আর নদীপারের জীবন একাকার। যতটা সামাজিক ততটা রাজনৈতিক। নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলোর মধ্যে বহুল পঠিত ও প্রচারিত উপন্যাস হলো পদ্মানদীর মাঝি। পঠিতের চাইতে বেশি প্রচারিত হলো তিতাস একটি নদীর নাম। এখানে তিতাসই মুখ্য। প্রধান চরিত্রও বটে। এরপর আসে গঙ্গা উপন্যাসের নাম। অথচ বোদ্ধা পাঠক মহলে সবচেয়ে বেশি প্রশংসিত গঙ্গা। নদীর পটভূমি বা নদীকেন্দ্রিক বাসিন্দাদের নিয়ে যতগুলো উপন্যাস রচিত হয়েছে তাতে গঙ্গার আসন সবার ওপরে। অবশ্য এর গুরুত্ব যতটা না কাহিনিতে তার অধিক পটভূমিতে। কাহিনি হয়তো অতটা জমাট বাঁধতে পারেনি। তবে এর আখ্যান যাদের জীবন নিয়ে নির্মিত, তা ফাঁকফোকরহীন। এত নিখুঁত, নিটোল আর জলের সঙ্গে মানুষের এমন গভীর সংগ্রাম অন্য কোনো নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসে দেখা যায় না। অধ্যাপক হীরেন চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত খানিকটা এরকম। মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে তাঁর লেখনী থেকে এখানে কিছুটা উদ্ধৃত করা হয়তো সমীচীন হবে। কারণ এখানে আছে গঙ্গার পাশাপাশি আরো দুটি উপন্যাসের তুলনা। তিনি বলেছেন – জলের সঙ্গে মানুষের এই সংগ্রাম, এই মধুর প্রতিদ্বন্দ্বিতার চিত্র পাই না আমরা অন্য কোনো নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসে, অন্তত এমনি করে। তিতাসকে অবলম্বন করেও মানুষ হিসেবে হয়তো বেঁচে ওঠা যায় অন্তত তার প্রমাণ, কিন্তু সেই কল্পবীজ এ উপন্যাসে শাখায়িত হতে পারেনি। হোসেন মিয়া ময়নামতীর দ্বীপে পদ্মার প্রতিস্পর্ধী এক জনবসতি গড়ে তুলতে চেয়েছে, কিন্তু তার সে প্রয়াসও রহস্যময় থেকে গিয়েছে। কিন্তু গঙ্গার বুকে মালো পরিবারের মাছমারা ছেলে সমুদ্রের স্বপ্ন এমনভাবে লালন করেছে মনের মধ্যে, প্রতিহত করা যায়নি তাকে। গঙ্গাকে এভাবে পেরিয়ে যেতে পারে বলেই গঙ্গা এই জাতীয় উপন্যাসগুলির মধ্যে স্বতন্ত্র। (গঙ্গা : একটি সমীক্ষণ, মৌসুমী প্রকাশ, আগস্ট ২০১১-এর ভূমিকা) আলোচনার শুরুতে এমন উদ্ধৃতি দিলাম এই জন্য যে,

পাঠকের সহজ হবে গঙ্গাকে স্বতন্ত্র ভাবতে। বুঝতে সমর্থ হবেন, সমরেশ বসু জনজীবনের শিল্পী হিসেবে কতটা সার্থক। যদিও গঙ্গা উপন্যাস রচনার আগেই সমরেশ বসু আমাদের কাছে জনজীবনের কথাকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। যেমন উত্তরবঙ্গ (১৯৫১), নয়নপুরের মাটি (১৯৫২) এবং পরের দু-বছরে প্রকাশিত বি টি রোডের ধারে ও শ্রীমতী কাফে এই খেতাবের জন্য যথেষ্ট ছিল। দেশ, সমকাল, মাটির মানুষের সজীব ও উষ্ণ ছোঁয়ায় অনেক বেশি প্রাণবন্ত ছিল এই চারটি উপন্যাস। আর ১৯৫৫ সালে শারদীয় পত্রিকায় গঙ্গা প্রকাশিত হলে হইচই পড়ে যায় সাহিত্যপাড়ায়। প্রমথ সেনগুপ্ত 'অমৃতসন্ধানীর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য' শিরোনামে এক স্মৃতিকথায় বলেছিলেন, 'গঙ্গা, সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসমালার মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় রচনা।' জনপ্রিয়তার কারণ হতে পারে, এত কাছে থেকে দেখা নদী-জীবনের রূঢ় বাস্তবতার নিখুঁত রূপময়তা। আর সমরেশ বসু বলেই হয়তো তা এত করে সম্ভব হয়েছে। কারণ জীবনের কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে তাঁর মেলামেশা অনেক দিনের; 'আদাব' গল্পে আমরা যার চিহ্ন দেখেছি অনেক আগেই। তিনি কতটা সাধারণ জীবনের কাছাকাছি ছিলেন তা স্পষ্ট করা যেতে পারে শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের লেখনী দিয়ে। তিনি বলেছেন, 'সমরেশ বসুর জীবন নিয়ে আর বেশি কী বলার আছে? মাত্র বাইশ বছর বয়সে 'আদাব' গল্প লিখে তুলকালাম কান্ড বাধিয়ে দিয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা নিয়ে এত অসাধারণ একটা গল্প একজন বস্তিবাসী, আধা-শ্রমিক মানুষের হাত দিয়ে কী করে বেরোলো কে জানে! দুই সম্প্রদায় সম্পর্কেই কী নির্মোহ, কিন্তু সহানুভূতিতে দ্রব মনোভাব।' (সমরেশ বসু : 'জীবনযুক্ত মুক্তপুরুষ'; সমরেশ স্মৃতি; ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ)। এই যে 'বস্তিবাসী আর আধা-শ্রমিক', এটিই সমরেশ বসুর লেখক জীবনের বাস্তবতার বাস্তবতা। সাধারণ মানুষের জীবনের খুব কাছাকাছি যাওয়ার বাস্তবতা। সমরেশ বসু যা লিখেছেন তা কাছে থেকেই লিখেছেন। ছায়া দেখে নয়, কায়া দেখে। গঙ্গার পটভূমি রচনার পেছনেও তাই রয়েছে আরেক পটভূমি। আতাপুরে থাকার সময়ে মালোপাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে লেখক মাছ ধরতে যেতেন। কখনো বর্ষার পুরো মৌসুম ধীবর বন্ধুদের সঙ্গে মাছ ধরেছেন গঙ্গায়। তিনি দেখেছেন তাদের হাসি-কান্না, ক্ষোভ, অভিমান, টানাপড়েন, ধার-দেনা, সুদ আর তা পরিশোধের নির্মম বাস্তবতা। তিনি দেখেছেন জাল,

জল ও জেলে-জীবনের গৃহস্থালি। আর আমরা পেয়েছি গঙ্গা। সমরেশ বসু গঙ্গা উপন্যাসের ভূমিকায় স্বীকার করেছেন জেলেপাড়ার সেসব বন্ধুর ঋণ। তিনি যাদের কথা উল্লেখ করেছেন তাদের কয়েকজনের নাম হলো – 'আতাপুরের মালোপাড়ার কার্তিক দাস, পরেশ দাস এবং হালিশহরের নিমাই অধিকারী ও তাঁর পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এঁদের সঙ্গে অনেক দিন ও রাত্রি আমার কেটেছে গঙ্গার বুকে। এঁদের সাহায্য ছাড়া 'গঙ্গা' রচনা সম্ভব ছিল না।' লেখকের এই সরল স্বীকার আর ঋণ আমাদের শ্রদ্ধা জাগায় রচকের দায়বদ্ধতার প্রতি। লেখকসত্তায় কত বেশি সৎ থাকলে একজন লেখক তাঁর কোনো সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত করবার জন্য এতটা শ্রম দিতে পারেন, তা আমাদের কাছে বিস্ময়। সমরেশ বসুর গঙ্গা-ক্ষেত্র প্রস্তুতির অনেকটাই উন্মোচন করেছেন হালিশহরের রামপ্রসাদ লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক নিমাই চাঁদ অধিকারী। তিনি সমরেশ বসু: স্মরণ সমীক্ষণ গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল – 'সমরেশ দার গঙ্গা ও আমরা'। এখানে তিনি আলোচনা করেছেন, লেখক কীভাবে গঙ্গা-মাল্য নির্মাণের মণিমুক্তা সংগ্রহ করেছেন। কীভাবে হাজারো প্রশ্নবাণে চার-পাঁচ বছর ধরে জর্জরিত করেছেন তাঁদের। সমরেশ বসু একটা সত্যও উদ্ঘাটন করেছেন বটে; যা স্পষ্ট হয় নিমাই চাঁদের কথায় – 'মাছধরাদের একটা নিজস্ব ভাষা (Technical words) আছে, আমি তা খেয়াল করিনি।... পেশার সাথে ভাষার এত মিল সমরেশদার প্রশ্ন করার আগে পর্যন্ত, সত্যি কথা বলতে কী, বুঝিনি। 'গঙ্গা' বইয়ে সেই সব শব্দের কিছু প্রতিফলন হয়েছে।' হয়তো সেই কারণেই, পদ্মানদীর মাঝি ও গঙ্গার পটভূমি এক হলেও চরিত্র-চিত্রণ, ভাষা, কথোপকথন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, মোটকথা সবকিছু উপস্থাপনার গুণে উপন্যাস দুটির অবস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে যোজন যোজন দূরে। গঙ্গা উপন্যাসের সার্থকতা এখানেই। সার্থক সমরেশ বসু। আসলে একজন মহৎ শিল্পী যখন বিশেষ কিছু রচনার জন্য একটি জনপদ বা একটি সম্প্রদায়কে বেছে নেন, তখন তিনি তার আদ্যোপান্ত জানার চেষ্টা করবেন, এটাই স্বাভাবিক। পার্ল এস বাক গুড আর্থ (THE GOOD EARTH) রচনার পূর্বে দীর্ঘদিন চীনে গিয়ে বাস করেন। যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করলেও ধর্মপ্রচারক বাবা-মায়ের সুবাদে বাকের শৈশব ও কৈশোরের সতেরো বছর কাটে চীনে। ইংরেজি ভাষার

পরিবর্তে তাঁর প্রথম ভাষা হয় চীনা ভাষা। মাঝের কিছু সময় যুক্তরাষ্ট্রে কাটালেও পরবর্তী সময়ে আবার ফিরে আসেন চীনে। সিংকিয়াংয়ের চীনা পরিবেশে থেকেই তিনি নিবিড় হয়ে ওঠেন চীনের সনাতন ক্ষয়িষ্ণু সমাজ, প্রচলিত জীবনধারা আর হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনা ভরা ঘাত-প্রতিঘাতের পারিবারিক জীবনের সঙ্গে। বাক চৈনিক সমাজের এই জীবনপ্রবাহকে শিল্পীমনের গভীর ব্যঞ্জনা, অভিজ্ঞতা আর কল্পনার ছোঁয়ায় মূর্ত করে তোলেন গুড আর্থে। মাটি যাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তাদেরই একজনের জীবন-প্রবাহের আবর্তনে নির্মিত গুড আর্থ। সঙ্গে আছে আরো ঘটনাপ্রবাহ ও আরো মানুষের সমাগম। নগণ্য চাষি ওলাঙ লাঙ এই আবর্তের মধ্যিখানে সর্বসহা। করুণাময়ী মৃত্তিকা আর ওলাঙ লাঙের মাঝখানে সবসময় ছিল বহু বাধা – বন্যা, দুর্ভিক্ষ, বিপ্লব। মোটকথা পূর্বপ্রস্তুতি আর বিশেষ লক্ষ্য ছাড়া এই মহৎ সৃষ্টি কখনই সম্ভব নয়। আর সম্ভব হয়েছে বলেই জয় করেছেন পুলিটজার আর নোবেল পুরস্কার। জয় করেছেন বিশ্ব। পার্ল এস বাকের গুড আর্থকে টানলাম কারণ, একই মানদন্ডে গঙ্গা অনেকখানি যে পিছিয়ে আছে, তা নয়। পিছিয়ে রাখবার ক্ষেত্রের দায়ভার আমরাও (বিশেষ করে আলোচক-সমালোচক, অনুবাদকও) অনেকাংশে এড়িয়ে যেতে পারি না।সমরেশ বসু রূঢ় বাস্তবতার নিখুঁত কারিগর। তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলো মূলত সমাজের নিচের মানুষদের নিয়ে রচিত। গল্পগুলোর আখ্যানজুড়ে রয়েছে সেই মানুষদের টিকে থাকার সংগ্রাম। এই ধারার গল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো – 'বিষের ঝাড়', 'পার', 'রং', 'ছেঁড়া তমসুক', 'পসারিণী'সহ আরো অনেক। এই ধারায় গঙ্গা হলো একটি মহীরুহ। গঙ্গা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে যে বিষয়গুলো সবার আগে আসে, তা হলো এর পটভূমি, চরিত্রগুলোর স্বাভাবিক বিচরণ, ঘটনার উপস্থাপন আর বাস্তবতার উপযোগিতায় ভাষার প্রয়োগ।গঙ্গার পটভূমি একটাই, জল-জাল-জেলে। গঙ্গা উপন্যাসের চরিত্রগুলো সামনে অতটা উজ্জ্বল হয়ে ধরা দেয়নি। পদ্মানদীর মাঝিতে যতটা উজ্জ্বল হয়ে আছে কুবের, মালা, সেতলবাবু কিংবা কপিলা। এদিক থেকে বলা চলে সমরেশ বসুর মূল বিষয় চরিত্র চিত্রণ নয়, মূল বিষয় জেলেজীবন। জেলেজীবনের সংগ্রাম চিত্রণ করতে যা যা প্রয়োজন, তা করেছেন। চরিত্রের ক্ষেত্রেও তাই। এখানে মোটা দাগে যারা রয়েছে: সাইদার নিবারণ, নিবারণের ছোট ভাই পাঁচু ও ছেলে বিলাস,

বশীর, সয়ারাম, পাচী (ছায়া), রসিক, দুলাল; অপরদিকে অমর্তের বউ, দামিনী, হিমি, হিমির সখী আতর, মহাজন ব্রজেন ঠাকুর প্রমুখ। আপাতদৃষ্টিতে এই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা হলো বিলাস ও হিমি। কিন্তু সব চরিত্র যার ছায়া অবলম্বনে, তিনি হলো নিবারণ। সেদিক থেকে নিবারণ হলো কেন্দ্রীয় চরিত্র। নিবারণের সব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তার ছেলে বিলাসের মধ্যে। নিবারণকে আমরা হারিয়েছি উপন্যাসের প্রথম ভাগেই। বৃহদার্থে হয়েছে শহিদ। ন্যায় ও সত্যের পক্ষে থেকে করেছে জীবন সংগ্রাম। অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেনি কখনো। এখানে নিবারণের প্রতিপক্ষ মহাজন, তার রক্তচক্ষু, কখনো নিঠুর গঙ্গা, সমুদ্র ও তার মীন। তাইতো বাটা মাছের চক তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ভাটার টানে, যেখানে চলছিল ঢেউয়ের মাতন।গঙ্গা উপন্যাসের মূল বাস্তবতা হলো বহির্বাস্তবতা। সবকিছুই দৃশ্যত আর চিরায়ত। গঙ্গা বা সমুদ্রের জেলে মানেই ঋণী; ঋণের প্রতিনিধি। ঋণের বোঝায় নিমজ্জিত হতে হতেই তা শোধের চেষ্টা করতে হয় মরণপণ। ঘরে দেনা বাইরে দেনা। তাদের রাগ করতে নেই, অভিমান করতে নেই। 'মাছমারারা মানুষের পরে রাগ করে না। যার পরে করে, তাকে দেখা যায় না এ সোমসারে।' তাদের বিধাতা জেলে নৌকায় থাকে না; থাকে মহাজনের চোখ রাঙানিতে। জেলে-জীবনের বড় বাস্তবতা টিকে থাকা। তারা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে জানে না; পারে না। 'সে যদি হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে, জানবে সেটা ন্যায্য। সে কখনো নিজেকে ফাঁকি দেয় না। মহাজন হুতোশের উপর হুতোশ চাপায় শুধু।' এই উপন্যাসের অন্তর্বাস্তবতা যা আছে, তা হলো, জেলে-মনের নয়, জেলে-জীবনের।শহর নিকটের রেললাইনের সৌন্দর্য নাকি বস্তি। বস্তি না থাকলে তা বেমানান ঠেকে। ঠিক জেলেজীবনের বীভৎস সৌন্দর্য হলো অভাব। ধারদেনায় তাদের অস্তিত্বও নিজের অজান্তে বন্ধকি হয়ে যায় মহাজনের কাছে। মীনের জীবন জলে, আর জেলের জীবনও জলে অর্থাৎ মীনে। আর এই জীবন বাঁধা থাকে এক অদৃশ্য সুতায় মহাজনের লাটাইয়ে। সে ইচ্ছা করলে টান দেয়, আবার ইচ্ছা করলে ঢিল দেয়। জেলেপাড়ায় অভাব আছে মহামারি হয়ে। অথচ কত শান্ত ও নীরব। মরণ দেবতা হানা দেয় ঘরে ঘরে। তার ভয়ংকর সংহার মূর্তি সবকিছু ভেঙে ফেলতে চায়। ভাঙতে চায় জেলে-জীবনের গেরস্থালি। সমরেশ বসুর ভাষায় –বাপ-ছেলেয় মারামারি করছে, বউ-সোয়ামি

ছাড়াছাড়ি করছে। এই না মাছমারার জীবন! এক কোটালে বাঁচে, আর এক কোটালে মরে। মাছের প্রাণের চেয়েও তার আয়ু টলোমলো।এর পরেই আবার বলেছেন –ঘা যখন হয়, তখন তাড়াতাড়ি হয়। দেখতে দেখতে দগদগিয়ে ওঠে। সময় লাগে শুকোতে। এখন কারুর শুকোবার ভাবনা নেই। জ্বালা জুড়োয় কেমন করে, সেই ভাবনা।এই হলো প্রকৃত আর নিঠুর বাস্তবতা। এখানে প্রতিরোধ নেই, যা কিছু আছে তা প্রতিকার। ভবিষ্যৎ নেই, আছে শুধু বর্তমান। কঠোর বর্তমানের মোকাবিলা করতে করতেই ঝাপসা হয় অতীত। হারিয়ে ফেলে প্রতিবাদের ভাষা। যত অভিমান তার নিজের প্রতি। তার জন্মের প্রতি। কখনো কখনো ভাগ্য আর বিধাতা গুলিয়ে ফেলে। ধীবরজীবনের বিবেক বলে ওঠে – 'বড়ো লাঞ্ছনা গো মা। কাকে অভিশাপ দেব আমরা, ঠাহর পাচ্ছি নে। চিনি শুধু তোকে। সাংলোর সলি দিয়ে মারব নাকি তোকে।' অবশেষে তারা দাঁড়ায় গঙ্গার মুখোমুখি। যেন অধিকার আদায়ের মৌনমিছিল। এখানে গঙ্গা মা, আর সবাই নিরুপায় সন্তান। শুরু হয় নলেন টানা। পাতা বেদিতে হত্যে দিয়ে পড়ে তারা। এই নলেন টানা অর্থাৎ আমরণ অনশন তারা ভাঙবে না, যতদিন না মা তাদের কিছু দেন। সবাই গোল হয়ে বসে হরিধ্বনি দেয়, জোয়ারের বেলা এলে নামগান করে, ধূপ পোড়ায়। চিল্লিয়ে বলে – 'মা.. মা গো'। আবার বেদির সামনে মুখ ঘষে গ্যাঁজলা তোলে মাকে ডাকতে ডাকতে। অথচ 'গঙ্গা চলে দুর্বোধ্য হেসে, কুলুকুলু করে।' এখানে জেলেদের কান্না যেন কান্না নয়, উপোসী চিলের চিৎকার। আবার কখনো তারা পূজা করে ঢ্যালাপ্যালার।জেলেদের বোধ সহজ-সরল। তারা প্রতারণা জানে না। তারা সারাক্ষণ যুদ্ধ করে জীবনের জন্য। টিকে থাকবার জন্য। এ-জীবন যে বাঁচিয়ে রাখে, সে তাদের কাছে প্রাণের ঠাকুর। মাছমারা মালোরা মানে, মাছের দেবতার নাম খোকাঠাকুর। দেবতার আকার তারা দেখেনি। নিজের হাতে মারা মাছের উতোল চোখে দেখতে পায় তাকে। তারা মাছের গোল চোখকে ভাবে খোকাঠাকুর। দেবতা ভেবে পূজা করে। কারণ তারা জানে, যখন জল দেয় তখন ডাঙাও দেয়। ধার পাওয়া যায়। ধার শোধ করা যায়। ধৃত মীনচক্ষুতে মহাজনের আশীর্বাদ যেন ঝিলমিল করে ওঠে। মাছ ধরার মৌসুমে যখন জাল ভরে মাছ উঠে আসে, তখন সুদিন ফিরে আসে জেলেপল্লীতে। অন্তত খেতে পায় পেটপুরে। খাবারে আসে বিলাস। গঙ্গা

উপন্যাসে জেলেদের সুদিনের খাদ্যবিলাসের বর্ণনা এসেছে এভাবে – 'মাছমারারা এখন ভালো খায়, একটু পিঁয়াজ কাঁচা লঙ্কাও আসে। ডেঙো ডাঁটার সঙ্গে দু-চারটে গোল আলুর শখের খাওয়াও দেখা যায়।' এই হলো তাদের খাদ্যবিলাস। মাছমারার খাদ্য-উৎসব। তাহলে আকালের দিন তাদের কেমন, তা আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। তাদের সুখ ঘাসের ডগায় জমা শিশিরের মতো। ঝলকানি বেশিক্ষণ থাকে না। প্রকৃত অর্থে তাদের তুষ্টির দিন বলে কিছু নেই এ-সংসারে। মাছ মেরে চলে তাদের জীবন। অর্থাৎ মাছের মরণেই তাদের জীবনের আশ। তারপরেও সাইদারের সাফ কথা –প্রাণ নিয়ে কারুর সঙ্গে টানাটানি করে লাভ নেই। তুমি মাছমারা। মাছ তোমাকে সাক্ষাৎ মারে না। কিন্তু মাছেরই ঝাঁকে, তারই চলাচলের পথে, গহিন আশ্রয়ে ওঁৎ পেতে থাকে তোমার মরণ। যতক্ষণ বাঁচিয়ে রাখবার, সে বাঁচিয়ে রাখবে তোমাকে। লীলা শেষ হলে সে আসবে অন্য মূর্তি ধরে।এখানে সুদিন আর দুর্দিন চলে পাশাপাশি। চলে জীবন আর মরণও। এখানে মাছ পেলেও বিপদ না পেলেও বিপদ। দাম নামিয়ে আনে মহাজনেরা। একশ থেকে আশি, আশি থেকে পঞ্চাশ; এভাবে। মাছ পচে গন্ধ ওঠে আকাশে। অনেক সময় মাটিচাপা দিতে হয়। সুদিন হয়ে আসা তাদের সুখপাখি ইলিশ। বিধাতার এ এক প্রকাশ্য বিদ্রূপ।এই উপন্যাসে সমরেশ বসুর বড়গুণ পাঠককে জেলেপাড়ার বাসিন্দা করে তুলবার ক্ষমতা। জেলেপাড়ার ভাষা, বিশেষ শব্দ, এমনকি উচ্চারণেও বিরক্তি নেই পাঠকের। যেন কতদিনের যোগসূত্র জেলেদের সঙ্গে, জেলেপাড়ার সঙ্গে আমাদের। তাদের সঙ্গে গলাগলি করে এসেই যেন পড়তে বসেছি এই উপন্যাস। গঙ্গা পড়তে পড়তে কখন যেন মনের মধ্যে বেজে ওঠে, আমার পূর্বপুরুষ কি জেলে ছিল? যদিও নৃ-বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ অমনটাই ইঙ্গিত করে। কারণ, অনেক নৃতাত্ত্বিক মনে করেন, পশুচারিক মানুষ নয় – মৎস্যজীবী মানুষই প্রথম আরম্ভ করে কৃষিকাজ। মানুষ যেখানে মাছ ধরার ভালো সুযোগ পেয়েছে, সেখানেই গড়েছে স্থায়ী জনপদ। পরে এসব স্থায়ী জনপদে প্রথম আরম্ভ হতে পেরেছে কৃষিকাজ। আর বাংলাদেশের বহু অঞ্চল গঠিত হয়েছে নদীবাহিত পলিমাটি জমে। ইতিহাস বলে, এসব জায়গায় প্রথম উপনিবিষ্ট হয়েছিল মৎস্যজীবী মানুষ। হয়তো এই সূত্রতার জেরে গঙ্গার মাঝপথে যাবার আগেই আমরা বুঝতে পারি – সাংলোজাল, খুঁটলি, গড়ান, বাঁধাছাদি জাল,

চলন্তাজল, মুকড়াজল, জলেঙ্গাজল, জোয়ার-ভাটা আর মরাকটাল ভরাকটালে জেলেদের মাছ মারার পদ্ধতি সম্পর্কে। জেলেপাড়ার একান্ত নিজস্ব শব্দগুলো সমরেশ বসু তাঁর শিল্পরঙে ডুবিয়ে ভদ্র সমাজের ভাষা করেছেন; করতে পেরেছেন। তাই হয়তো আমরা সহজেই বুঝতে পারি কঞ্চি কখন সলি হয়। আর এসব বুঝতে পারি সমরেশ বসুর উপস্থাপন কৌশলের কারণে। অনেকগুলোর মধ্যে থেকে একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে :নৌকা কর পুব-পশ্চিমে আড় পাথালি। ভেসে যাও পাথালি নৌকা নিয়ে ভাটার টানে। যে আসার, সে আসবে উজান ঠেলে তোমার জালে। পড়বে এসে হাঁ-মুখে। খবর পাবে কেমন করে? জালে ঠিক মাঝখানে বাঁধা আছে সরু সুতো। তাকে বলে খুঁটলি। সেই খুঁটলি জড়ানো তোমার আঙুলে, যে আঙুলে তোমার সমস্ত মন বসে আছে। জলে তোমার ছোট চাকুন্দে মাকুন্দে পড়লেও, খবর আসবে তোমার খুঁটনিতে। যেমনি খবর পেলে, অমনি ওকোড় মারো কাছি ধরে। যত জোরে পারো। সাংলোর হাঁ বুজে যাবে কাপটি খেয়ে। দেরি নয়, টেনে তোলা। ঢিল দিলে হাঁ খুলে যেতে পারে। ওকোড় মারা হলো কাছির টান। আর এই সাংলো ফেলে পাথালি নৌকা ভেসে যাওয়াকে বলে গড়ান মারা।ঠিক এভাবে অনেক জায়গা জুড়েই রয়েছে জেলেপল্লীর অনেক বিষয়ের প্রস্তাবনা। যা থেকে পাঠক ক্রমশ ঢুকে পড়তে পারে জেলে-জীবনের গভীর থেকে গভীরদেশে। পাঠক আনমনে মাথায় বাঁধে গামছা, খুঁটলিটাও কখনো জড়িয়ে ফেলে আঙুলে।জেলেপাড়ায় একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, ভালোবাসা, মাথা নোয়ানো কিংবা স্নেহ-ভালোবাসা দুই পরতে সাজানো। একপাশ যতটা নিখাদ, অন্যপাশে ততটাই দায়সারা। শোষক শ্রেণিদের কাছে মাথা নোয়াতে হয়; এটাই নিয়ম। বেদান্তের অধিক। যতই তোমার তেলে তোমাকে ভাজুক। তোমার জীবন যতটা না বাঁধা বিধাতার কাছে, তার অধিক মহাজনের কাছে। জাল দড়ি নিজের বলতে কিছু নেই। তোমার জাল কোনো না কোনোভাবে বাঁধা পড়ে তাদের কাছে। যতই এ জালের খুঁটলি জড়ানো থাকুক তোমার কব্জিতে। অনেক ক্ষেত্রে বাঁধা পড়ে ঘরের বউ, সেয়ানা মেয়ে। নিদেনের দিনে মহাজন বলে ওঠে – ‘তোমার বাড়িতে যাব হে। দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলব। বউয়ের শরীরে কাপড়চোপড় আছে তো। শুনেছি, মেয়েটি তোমার ডাগর হয়েছে।’ মহাজনের সাফ কথা, জলে মাছ না থাকুক, ঘরে মেয়েমানুষ আছে

তো। তুমি গুড্ডি, আর বিধাতা এর নাটাই বড় সম্মানের সাথে বেঁধে দিয়েছে মহাজনের হাতে। যত খুশি খেলো, যত খুশি নাটাই টানো, খ্যাঁচ মারো। সে অধিকার নিজেই দিয়েছে বিধাতা। ধীবর জীবন তা জানে; আর মানেও মনেপ্রাণে। এ-শ্রদ্ধায় যতই থাকুক বিতৃষ্ণা; তবে তা মনে মনে। অপরপক্ষে, প্রকৃত সম্মানীয়র প্রতি সম্মান আর শ্রদ্ধা বড় খাদহীন। শ্রদ্ধার মানুষটি তাদের কাছে হয়ে ওঠে দেবতা। অলীক দেবতার বিপরীতে যেন প্রাণের ঠাকুর। চলমান সংসারের প্রতিটি কাজেই থাকে তার উপস্থিতি। এখানে পাঁচুর কথা বলা যেতে পারে। পাঁচু তার জেলে-জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে দেখতে পায় তার ভাই নিবারণের উপস্থিতি। নিবারণের ছেলে বিলাসকে গালি দেওয়ার সময়ও তাকে সাবধান থাকতে দেখা যায়। যেন এখানেও বড় ভাইয়ের অসম্মান না হয়।বিলাসকে গালাগাল দেবার ওইটি পাঁচুর ধরন। কোনোকিছুর 'পো' গাল দেয় না কখনো। শোরের পো কিংবা গাড়লের বাচ্ছা, ওসব বলবে না। তাতে যে নিবারণকে গালাগালি দেওয়া হয়। গুণীন, সাইদার, গুরু নিবারণ। তাকে গালাগাল দিতে পারবে না প্রাণ গেলেও। গাড়লের নাতি, না হয় শোরের ভাইপো বলবে। সমরেশ বসু গঙ্গা উপন্যাস রচনা করেছেন শুধু রচক হয়েই নন, তিনি এর বাইরেরও একজন ছিলেন এখানে। কখনো তিনি সুদখোর মহাজন, কখনো সুদ-ঘানিতে পিষ্ট জেলে। কখনো সাইদাররূপী বাছারি নাওয়ের মাঝি। কখনো মাছের বাজারে ফড়িয়া। তিনি আছেন জোয়ারে, ভাটাতে; আছেন মরাকটালে কিংবা ভরাকটালে। তিনি ভালো করে জানেন, জলেঙ্গা জলের প্রস্তাবনা কীসের ইঙ্গিত। আর এই সবকিছুতে এক হতে পেরেছেন বলেই তিনি বিশাল ক্যানভাসে অাঁকতে পেরেছেন জেলে-জীবনের এমন নিখুঁত ছবি। এক হতে পেরেছেন বলেই হয়তো, কেন জানি মনে হয়, গঙ্গা বুনোনের প্রতি ভাঁজে ভাঁজে রয়েছে অাঁশটে গন্ধের ভুরভুরি। উপন্যাসটি পাঠের শেষে একে বুকে ঠেকালে অাঁশটে গন্ধের অনুভূতি কোথায় যেন মৃদু আঘাত করে। এ এক বড় সাফল্য সমরেশ বসুর। দু-একটি উপমার কথা এখানে বলা যেতে পারে।টকটকে লাল শাড়ি পরেছে একখানি। তাজা ইলিশ-কাটা গাঢ় রক্তের মতো লাল। জামা গায়ে দেয়নি।...(হিমির শাড়ি)বাছাড়ি নৌকা যেন বড়শিতে গাঁথা মাছ। ছিটকে টেনে চলে যেতে চায়।রূপখানি তো আছে। তার উপরে কালিন্দী আর রাইমঙ্গলের মোহনার হ্যাঁকা

লেগেছে শরীরে। (হিমির যৌবন)... নাকখানি বেশ উঁচু ছিল। চোখ দুটি তেমন বড়ো নয়। কিন্তু ধার ছিল খুব। মস্ত অাঁশবঁটিখানির সামনে মানাত তাকে। আঁশবঁটির ধার যত দেখতে ইচ্ছে করে তত ভয় হয়। দামিনী ছিল বাজারের তেমনি মেয়েমানুষ। সেও একখানি অাঁশবঁটি, এর (বলাগড়ের নৌকা) পেট মোটা, মাঝখানটি চওড়া। জায়গা বেশি, মাছ ধরবে বেশি খোলে। যদি তুমি মাছ পাও। দেখলে তোমার মনে হবে, এর চাল-চলন যেন একটু কেমন। আড়তদার কিংবা মহাজনের বউয়ের মতো, ভালোমন্দ খেয়ে, গায়ে গতরে ফেঁপে-ফুলে, হেলেদুলে চলা।এ পেটের লজ্জা নেই, বেহায়া জিভ। জাল ফেলে, দুই গড়ান দিলে, পেটে দানা চায়। জালে কিছু পড়ুক বা না পড়ুক দানা চায় পেট। নুন না ফেলে তখন মুখের ভাত নোনা লাগে চোখের জলে। হাত ওঠে না, পেটের জ্বালায় ওঠে চির। (জেলেদের চিরায়ত অভাব)ওপরের কথাগুলো প্রতীক কিংবা উপমা, যেভাবেই আসুক না কেন, এখানে আঁশটে গন্ধ স্পষ্ট। আর এগুলো গঙ্গা উপন্যাসে ঘটেছে বলেই হয়তো তা এত মহিমান্বিত। এই সার্থকতা বাংলা সাহিত্যের কোনো বিষয়ভিত্তিক উপন্যাসে ঘটেছে বলে আমার জানা নেই।এজরা পাউন্ড কবিতাকে চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছিলেন। উপাদান ব্যবহারের দিক থেকে একটি ছবিতে যে-কৌশল ব্যবহৃত হয়, কবিতাতেও তা করা সম্ভব কি না তার পরীক্ষা শুধু এজরা পাউন্ডই করেননি, করেছেন তাঁর সমসাময়িক আরো অনেকে। যেমন ছবিতে ব্যবহৃত প্রতিটি রং আমাদের চোখে এক এক করে ধরা পড়ে না, সমগ্র ছবিটি একটি অর্থ নিয়ে ধরা দেয় আমাদের চোখে। তেমনি কবিতার উপাদান শব্দ বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়ে একটি রূপ বা প্রতীক নির্মাণ করে গঠন করে কাব্য-প্রতিমা। ঠিক তেমনিভাবে জেলেপাড়ার বিশেষ শব্দ, ভাষা বা বিষয়গুলো গঙ্গাতে ব্যবহৃত হয়ে বিশেষ সুষমা লাভ করেছে। জেলেপাড়ার একান্ত নিজস্ব শব্দকে সমরেশ বসু তাঁর শিল্প-রজকে ডুবিয়ে ভদ্র সমাজের ভাষা করেছেন। উচ্চ সাহিত্যেরও। এর ভাষা অতটা কাব্যময় না হলেও (অনেকের মতে) কাব্যমূল্য রয়েছে। এ কাব্য জেলেপাড়ার, গঙ্গার বুকের। জেলে-জেলেনি, ফড়ে-ফড়েনি কিংবা জাল-জল, নৌকা-দড়ার মহাকাব্য। একটি ছবিতে প্রতিটি রং আলাদা আলাদা মর্যাদা পায় না, সামগ্রিক অর্থই ধরা পড়ে আমাদের চোখে। গঙ্গার বিশেষত্ব হলো – এর প্রতিটি রং ভিন্ন ভিন্নভাবে যতটা তাৎপর্যপূর্ণ,

ততটাই তাৎপর্যপূর্ণ এর সামগ্রিকতায়। তাই এখানে কাব্যমূল্য আর গদ্যমূল্য ভিন্নভাবে বিচার্য নয়। হয়তো সমার্থকও।রূপ-বর্ণনায় সমরেশ বসু অনন্য ও একক। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা কথাসাহিত্যে যদি রূপের যোগ্য পুরোহিত হন, তবে সমরেশ বসু রূপের যোগ্য কারিগর। কারিগর এ-কারণে যে, যদি বঙ্কিমচন্দ্র নরম মাটিতে নির্মিত প্রতিমার রূপ বর্ণনা করে থাকেন, তবে সমরেশ বসু পাথর খোদাই করে আগে ভাস্কর্য গড়েছেন, অতঃপর প্রশংসা করেছেন তার রূপের। এ-রূপ সৃষ্টি একান্ত নিজের এবং তার প্রশংসা বা বর্ণনাও নিজের। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা যেমনটি ভাবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মধুসূদনের বেলায়। গঙ্গায় রূপ-বর্ণনা হয়েছে অমর্তের বউ, নিবারণ, বিলাস, দামিনী, হিমির। এখানে শুধু রূপ-বর্ণনাই হয়নি। এই বর্ণনার ভেতর দিয়ে সমরেশ বসু যেন খন্ড খন্ড করে নির্মাণ করেছেন প্রতিটি চরিত্র। নির্মাণ না বলে পূর্ণতা বলা যেতে পারে। কারণ, উপন্যাস জুড়ে যখন চরিত্রগুলোর পূর্ণতা আসতে কিছুটা খানতি ছিল (লেখকের দৃষ্টিতে হয়তো), তখনই এই রূপ-বর্ণনা। এ শুধু রূপ নয়, ফুটে উঠেছে ব্যক্তিত্ব আর চরিত্রের দৃঢ়তা। যেমন দামিনীর পড়ন্ত যৌবনকে তুলনা করা হয়েছে আশ্বিনের নদীর সঙ্গে। –তখন অবশ্য দামিনী আশ্বিনের গঙ্গা। দেহের স্রোতে নাবারেরই ঢল। শুকোবে শিগগিরই। কিন্তু সেই তো শেষ টান। ওইখানে পড়লে, পুরুষের উঠে আসা বড় দুষ্কর। কেননা ওটা ছেউটি মেয়ের শুধু পীরিতের ঝাঁঝ নয়। সংসারের সব ঘাট অঘাট দেখা হৃদয় বড়ো গহন। তাতে জল বেশি। ঘূর্ণিও আছে।সমরেশ বসুর অভিনবত্ব এখানে যে, তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রূপ ফুটিয়ে তোলেন। হোক সে পোঁটাপড়ি কিংবা নাকবোঁচা কিংবা রং কাকের অধিক। সে শরীরেই এক এক করে অলংকার পরিয়ে বুক ফুলিয়ে বলবেন, এই তো আমার সুন্দর। যেমন হিমিকে সুন্দরী করে তুলবার জন্য লেখকের কত আয়োজন :গায়ে জামা নেই। একখানি শাড়ি পরে এসেছে। গাঢ় নীল দক্ষিণের সমুদ্রের মতো। তার ওপরে ছড়ানো সাদা রঙের ফুল। যেন সোনার মতো সোনা খড়কে মাছ ছিটিয়ে দিয়েছে। গায়ের রঙটি কটা কটা। খোলা চুল বাঁধা আছে আলগা করে। চোখ-মুখ একরকম। দেখে মনে হয় বটে, একটু যেন ভাবগম্ভীর মেয়ে। গড়নটি একটু ছিপছিপে। হাতে গলায় নাকে কানে সোনাও আছে। সাতরকম মিলিয়ে দেখতে ভালোই। বয়স কত আর। দেখে মনে হচ্ছে, ছেলেপুলে হয়নি আজো। গড়ন-পিটনে

একটু ছেউটি ছেউটি। অর্থাৎ শরীরখানি অকূল হয়নি, কূলের মুখে এসে থমকে আছে। বর্ষা এলে ভাসবে অকূল পাথারে। আন্দাজে বলা যায় বাইশ-চবিবশ হবে। কিন্তু সিঁদুরের দাগ নেই কপালে সিঁথেয়। এ কি বেওয়া না আইবুড়ো বোঝবার জো নেই।হিমিকে যোগ্য আসনে বসালেন লেখক। বলতে গেলে দায় সারলেন। এখন যা দায় পাঠকের। লেখক খেলবেন হিমিকে নিয়ে। আর ওপাশে পাঠক। এতক্ষণে যা হলো, তা মাঠ তৈরি করা। ভাস্কর্য খোদাই করলেন, সাজালেন। আবার কোনো দিকে না তাকিয়েই বলে বসলেন, বাহ চমৎকার! এ এক দুঃসাহস। পাঠক এখন ডুবো হিমির রূপে।আবার নিবারণ মালোর কালোতে আলো জ্বালিয়েছেন পরিপাটি করে। নিখুঁত বলাতে কালোকে কালো অর্থাৎ কুৎসিত মনে হয়নি। মনে হয়েছে কৃষ্ণ ঠাকুর। অভাব একটি বাঁশরি। বলেছেন –কালো কুচকুচে রঙ, পেটানো শরীর। নেহাইয়ের মতো শক্ত। যেন নিম কাঠের কালো রঙমাখা চকচকে মূর্তি। নাকটি ছোট। চোখ দুটি ঈষৎ গোল। ভ্রু কুঁচকে মুখ তুলে তাকালে মনে হয়, কেউটে সাপ যেন ফণা ধরে আছে। ভেড়ার লোমের মতো কালো কোঁচকানো চুল। যেন জাতসাপের ডিম-ফোটা শলুই কিলবিল করছে মাথায়। হাসলে পরে চোখ ঢেকে যায়। বনে জঙ্গলে দাঁড়িয়ে থাকলে রঙে রঙ মিশে যায়। গাব-আঠা মাখানো নৌকার কাঁড়ারে শুয়ে থাকলে, টের পাওয়া যায় না। এমন কালো।এ যেন কালোর এক মহিমাকীর্তন। মহিমান্বিত হয়েছে নিবারণ ও তার ছেলে বিলাসের রূপ। আর সমরেশ বসু বলেই হয়তো এক কৃষ্ণ-পাথরের চাঁইকে ছেনিয়ে ছেনিয়ে গড়েছেন এই কৃষ্ণমূর্তি। শিরীষ না ঘষেও কত উজ্জ্বল কত মসৃণ।

আর একজনের কথা এখানে না বললেই নয়। গাম্বিলতলার পাঁচী। গামলী পাঁচী। এ পাঁচী একজন পরোক্ষ চরিত্র। এখানে এর কোনো প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই। তাও আবার এক চিলতে শোনা কথা। বিলাসের বন্ধু সয়ারামের মাধ্যমে এ পাঁচী আসে পরোক্ষভাবে। তারপরও পাঠকমনে এ পাঁচী বড় প্রত্যক্ষ। পাঠক তাকে দ্যাখেনি কখনো। তার ইঙ্গিত ইশারা কিছুই নয়। তবুও। শুধু শুনেছে তার বাড়ন্ত যৌবনের ধুকপুকানির কথা। লেখক আসলে দেখিয়েছেন তার শিল্পসৌন্দর্য। পাঠক ডুবেছে তাতে। অনেক সময় জীবন্ত চরিত্রের আগে আগে হাঁটে এই পাঁচী। সয়ারাম জানে পাঁচীর আসল কথা, আসল রূপ। তাই বিলাস যখন পাঁচীকে ‘বড় একফোঁটা মেয়ে’ বলে

তাচ্ছিল্য করে, তখন চটে যায় সয়ারাম। খেঁকিয়ে বলে – ‘পাঁচী যদি একফোঁটা মেয়ে, তবে গাঁয়ের মধ্যে ডাগর আছে কে আর। বাইরে বাইরে বয়স তেরো। ওদিকে ঘরের মধ্যে চোরাবান এসে যে পনেরো পার হতে চলল, সে খবর কে রাখে।’ লেখক পরে লোভ সামলাতে পারেননি গামলী পাঁচীকে খোলাসা করা থেকে। তিনি নিজেই দাঁড়িয়েছেন সয়ারামের পাশে। পাঁচীকে বলেছেন এভাবে –গতরে বল, গতরেও বাড়বাড়ন্ত কম নয় গামলী পাঁচীর। বর্ষার জোয়ার আসেনি। টান মরশুমের জোয়ারে, ছেয়ালো ছেয়ালো ভাবখানি বেশ হয়েছে। নাকখানি একটু বোঁচা। তা, মেয়েমানুষের বেশি তোলা নাকও ভালো নয়। চোখ দুটি ডাগর। শুধু ডাগর নয়, চোখ দুটিতে কিছু কথা আছে। সব চোখে কথা পাওয়া যায় না, চোখের মতো চোখ হলে কী সব কথা যেন থাকে।হোক সে গামলী পাঁচী। লেখক তাকে এমন জায়গায় নিয়ে গেছেন যে, মেয়ে পাঠক হলে তো অবশ্যই পাঁচীর নাক পড়বার সময় নিজের নাকে হাত বুলিয়ে কিছু একটা আন্দাজ করবেন। বোঁচা হলেও বলবেন, না ঠিক আছে। এ যৌবনের আবেশ পাঠককে শিহরিত না করে পারে না।গঙ্গা উপন্যাসে স্পষ্ট চরিত্রগুলোর মধ্যে সবার আগে আসে বিলাসের নাম। বিলাস চিন্তায় ও মননে একদম আধুনিক। সে জানে, যা করবার নিজেকেই করতে হয়; বিধাতা নয়। পাঁজিপাতিতে বিশ্বাস নেই তার। জেলেরা পাঁজি দেখেই নৌকা ভাসায়। আন্দাজ করতে সুবিধে হয়, মৌসুমের মাছ আর মরণের। কিন্তু বিলাস বলে অন্য কথা। – ‘যা আসবে, তা আমার জালে আসবে। পাঁজি লিখলেও আসবে, না লিখলেও আসবে। ও সবই তোমার জলের মর্জি।’ এই স্বাধীনচেতা ভালো লাগে না কাকা পাঁচুর। ঝগড়া হয় দুজনে। বিলাসকে নিয়ে একটা অহংকার আছে পাঁচুর মনে; কিন্তু একান্ত গোপনে। সে বিশ্বাস করে, জেলে-জন্মে উদ্ধত থাকতে নেই। লুকিয়ে রাখতে হয়, সত্য আর প্রতিবাদের ভাষাকে। কিন্তু বিলাস অন্যায়ের বিরুদ্ধে সব সময় প্রতিবাদী। মাথা গুঁজে সহ্য করার লোক সে নয়। পশ্চিমপারের মাছমারারা বাঁধাছাঁদি জাল পাতলে বাধে গন্ডগোল। কারণ বাঁধাছাঁদি জাল পাতলে অন্যপারের জেলেরা মাছ পায় না। সাংলো হোক আর টানাছাঁদিই হোক, কোনো জালেই কাজ হবে না। এর প্রতিবাদ করতে পারেনি কেউ। সবাই হাপিত্যেশ করলেও বিলাস হুংকার দিয়ে ওঠে। বিলাস হয় সবার সাহস। ঝাঁপিয়ে পড়াতে বিলাস

ছিল সবার নেতৃত্বে। পশ্চিমপারের পালোয়ান রসিককে একাই কুপোকাত করেছিল বিলাস। আবার পরে দেখি, এই গন্ডগোল মীমাংসার জন্য এগিয়ে আসে ওপর পাড়ার নেতারা। নেতারা সবখানে। গঙ্গাতেও। তারা দুপক্ষের লোক। কেননা, ভোট দুপক্ষেরই আছে। ভোটের রাজনীতিতে অন্ত্যজশ্রেণিও সমান মূল্যবান। সেদিন নেতাদের মুখের ওপর যা দু-এক কথা বলেছিল, তা ওই বিলাসই।বিলাস বাস্তববাদী, পরিশ্রমী এবং একাধারে প্রেমিকও। সে ভালোবাসে হিমিকে। ডেকেছে মহারানী বলে। সব অবসাদ দূর হয়েছে হিমির দিকে চেয়ে। হিমিও আপন করে পেতে চেয়েছে বিলাসকে। কিন্তু শেষ হয়েও হয়নি শেষ। বিলাস যতই প্রেমিক হোক না কেন, সে শেষ পর্যন্ত জেলে। তার জীবনের খুঁটলি জড়ানো জালে, জলে আর নৌকায়। বিলাস শেষ পর্যন্ত মানে, জেলেদের প্রেম করতে নেই, তাকে পরিণতি দিতে নেই। অথচ তার অভিভাবক পাঁচুও বিয়েতে মত দিয়েছিল শেষে। যে হিমি উদগ্রীব ছিল সারাক্ষণ, বিলাসকে কাছে পেতে। অথচ কাছে পেয়েও সেই হিমিই ইচ্ছা-মৃত্যু ঘটাল তার প্রেমের। নিজ হাতে লবণ দিয়েছে প্রেমজোঁকের মুখে। হিমি জেনে গেছে, বিলাসকে পেয়ে বসেছে সমুদ্র। সে সাইদার উপাধি পেতে চায়। হিমি আরো জেনে গেছে, যে মায়া বিলাসকে বদ্ধ করে, দগ্ধ করে, সে প্রেম বিলাসের জন্য মিথ্যা। বিলাস আজ অদৃষ্টকে ছাপিয়ে অকূলের আহবান আত্মস্থ করার স্বপন দ্যাখে। অন্যপক্ষে বিলাস সেই হিমির কাছেই পেয়েছে শান্তি, সমুদ্রের স্বাদ আর কাঙ্ক্ষিত মুক্তি। তাই সে বলেছে – ‘এই তেঁতলে বিলাসকে তুমি যা দিয়েছ, তা আর কেউ কাড়তে পারবে না। সে যে মহারাণীর দান গো, মহারাণীর দান। আমার প্রাণ জুড়িয়েছ তুমি, জুড়িয়েছ বলেই আমি সমুদ্রে যাব।’ এই হলো প্রকৃত বিলাস। জেলে বিলাস। মাঝে যা কিছু যেন খেলাচ্ছলের ঘটনা। যতই বলি মুক্তির স্বাদ বিলাসকে এনে দিয়েছে হিমি। কিন্তু মুক্তি তো তার মনে; তার রক্তে। কারণ পূর্বেই তার কাকা পাঁচুকে বলা কথায় আমরা পেয়েছি এমন আভাস। হিমির প্রসঙ্গ এলে বিলাসের সাফ কথা – ‘ভগবতীর মেয়ে এলেও সমুদ্রে যাব খুড়ো, গঙ্গায় আমার মন মানছে না আর।’ আসলে এখানে জেলেপাড়ার প্রতিনিধিত্ব নিজেই তুলে নিয়েছেন সমরেশ বসু। ভোলেননি যে, তিনি রচনা করছেন জেলে-জীবনের উপাখ্যান। বঙ্কিম রোহিনীকে (কৃষ্ণকান্তের উইল) মারলেন নীতির দোহাইয়ে। শরৎ অচলাকে

(গৃহদাহ) মারলেন আপন খেলায়। মানিক কুসুমকে (পুতুলনাচের ইতিকথা) ডোবালেন সামাজিক অসমে। আর সমরেশ বসু হিমি-বিলাসের প্রেমকে মারলেন জেলে-জীবনের অমোঘ নিয়মে। সমরেশ বসু এখানে নিজেও জেলেপাড়ার যোগ্য বাসিন্দা। আসলে গঙ্গা উপন্যাসে প্রতিটি চরিত্র পেড়ে পেড়ে বলার জোরালো কিছু নেই। কারণ, প্রতিটি চরিত্রই এখানে স্বমহিমায় উজ্জ্বল। অপ্রধান চরিত্রও প্রধান থেকে খুব একটা দূরে থাকে না। যেমন সয়ারাম না থাকলে বিলাস মিথ্যা, দামিনী না থাকলে হিমি। তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে বড় সত্য হলো, এখানে প্রধান চরিত্র নির্মিত হয়েছে জাল, জল, নৌকা, মহাজন, ফড়ে-ফড়েনি অর্থাৎ জেলে-জীবনের কাঁচামালে। আর একটু বাড়িয়ে বললে বলা হবে, এখনে প্রধান চরিত্র 'গঙ্গা' (গঙ্গা উপন্যাস) নিজেই।গঙ্গা উপন্যাসে সকল চরিত্রই এক অমোঘ নিয়মে বাঁধা। হাসিকান্নার দেবতা নিজেই রচনা করেছেন জেলে-সমাজের অলিখিত সংবিধান। আর এটি জেলেদের হাতে তুলে দিয়ে সেই দেবতার বসত এখন মহাজনপাড়ায়। এই সংবিধান তাদের সারা জীবনের পুঁজি। তাইতো দামিনী ও হিমি যতই কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে না উঠতে পারুক; তারপরও তারা ফড়েনির বাইরে যেতে পারেনি। এখানে ফড়েনি জীবনের একটি কথা না বললেই নয়। সমরেশ বসু ফড়েনি আতরের বেলায় বলেছেন – 'আতর সধবা নয়, বিধবা নয়, শুধু ফড়েনি।' ফড়েনি জীবনের জন্য এর চাইতে বিধ্বংসী কথা আর কী বা হতে পারে? এই বাক্যের ধ্বনি যেখানেই পৌঁছাবে, সেখানেই কম্পিত হবে মানবচিন্তা, মানব-বিবেক। আর এ-কারণেই বলতে ইচ্ছা করে, সমরেশ বসু জেলে চরিত্রেরও যোগ্য আর নিখুঁত কারিগর। যোগ্য আর জাত জেলেও বটে। অন্যদিকে পাঁচুর হাত ঘায়ে খসে পড়ার জোগাড়, তবু বসে থাকতে নেই। কারণ, জেলে সংবিধানে তা নেই। হাতে গাব লাগাও, ধরো খুঁটলি, দেও গড়ান। আবার এও ঠিক, জেলেপাড়ায় যতই শোকের ছায়া পড়ুক, গলা ছেড়ে কাঁদতে নেই। কারণ কোনো ধারাতে তা পড়ে না। তাছাড়া সংবিধান বলেছে, কাঁদলে সমুদ্রে ভাসন্ত খসমের অমঙ্গল হবে। তাইতো বিনিদ্র রাতে বউ নিশ্বাস নেওয়া-ছাড়ার ক্ষেত্রেও সতর্ক হয়, যেন তা দীর্ঘ নিঃশ্বাস না আবার হয়ে যায়। আমরা নিবারণ মালোর পরিবারের এক রাতের কথা বলতে পারি :বউ তার ঘুমন্ত সন্তান বুকে নিয়ে জাগে ঘরে। অন্ধকারে দু চোখ মেলে সেও ভেসে বেড়ায় ঘরের মানুষের সঙ্গে

সঙ্গে। এ বিধির বিধান নয়। বিধি দেয় রাত আর ঘুম। এই ঘরনী জাগে পোড়া প্রাণের বিধানে।নদীতে পুবে শাওটার ঝড় বয়। বউ একা ঘরে শুয়ে বুকে চাপে দীর্ঘশ্বাস। অমন নিঃশ্বাস ফেললে অকল্যাণ হয়। নিঃশ্বাস চেপে সে শুধু প্রহর গোনে।নিজের শ্বাস একটু লম্বা করেও ফেলবার অধিকার নেই জেলে-বউয়ের। এর চেয়ে রূঢ় বাস্তবতা আর কী-ই বা হতে পারে। এই অলিখিত দলিলের সারকথা – জেলে আর মহাজনের মধ্যে যেন কোনোভাবেই তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি না ঘটে। তাই দেখি ঝড়বৃষ্টির রাতে মাছমারার বউ অন্ধকার ঘর থেকে আঁচলের ঢাকা দেয়। এতে স্বামীর গা ভেজা বন্ধ হয় না। এটা সে জানে। তবু মনের সান্ত্বনা। তাছাড়া এও ভালো করে জানে, এ-জীবন মাছ মারার নিয়মের জালে জড়ানো। জেলে-পরিবারের কঠোর বাস্তবতা এখানে স্পষ্ট। 'তুমি মাছমারার বউ, তুমি জাগো বার মাস'। আনসিজনে রাত জেগে জাল বুনো কিংবা কখনো হাঁটুতে মাথা গুঁজে ভাবো – রাত পোহলে কী ফোটাবো আগুনে; কী বেড়ে দেব সামনে। আর মৌসুমে জেগে থাকো, জলে ভাসা সকল অনিষ্টের কথা ভেবে ভেবে। বর্ষা রাতের ঝিঁঝি পোকা তার মনেও ডাকে। এ-ডাকের একটাই অর্থ, কোথায় ভাসছে ঘরের মানুষ।আগেই বলেছি, গঙ্গার কাব্যিকতা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। তবে গঙ্গা উপন্যাসে যে অনেক কাব্য-উপাদান ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, তা অনিস্বীকার্য। কারণ, একজন কবিমনস্ক ব্যক্তি যদি গঙ্গা পাঠ করতে করতে লিখে থাকেন –মানব জীবন সে তোগঙ্গায় ভাসন্ত বাছাড়ির নাও।ফুটো থাকলেই টানতে থাকে তলানিতেআবার –মানব জীবন সে তোবর্ষার জোয়ার ভাটাজলেঙ্গার জল।দু দন্ড জোয়ার তো চার দন্ড ভাটাচার দন্ড সুখ তো আট দন্ড দুঃখ।তবে অবাক হবার কিছু নেই। এমন অনেক অনেক কবিতা লেখা যেতে পারে গঙ্গা পাঠান্তে।সমরেশ বসু গঙ্গা উপন্যাসে স্পষ্ট উদ্দেশ্যবাদী। অনেকটা বস্তুবাদীও। তিনি উদ্দেশ্য নিয়েই গঙ্গাতে নাও ভাসিয়েছেন। আর তাই জেলে বাস্তবতার বাইরে যেতে চাননি। এখানে ডাকাতি, রাজনীতি, মারামারি কিংবা মেয়েপাড়ায় যাওয়া বলি আর শহরের আলোকচ্ছটাই বলি না কেন, সবকিছুই আবর্ত হয়েছে জেলে-জীবনের বাস্তবতার নিরিখে। শব্দ, ভাষা, গালাগাল, এমনকি নারীর রূপেও কোথায় যেন একটা আঁশটে গন্ধের ছোঁয়া। লেখক যখন বুঝতে পারেন, তাঁর নিরেট বাস্তবতার বুনোটে পাঠক ধাক্কা খেতে পারে, ঠিক তখনই নিজে হলুদ পোশাক

পরে উপস্থিত হয়েছেন বিবেকের ভূমিকায়। এবার পাঠক মনোযোগী শ্রোতা, যাত্রা প্যান্ডেলে। বিবেক দরাজ গলায় আলগা করছেন ভাষা কিংবা কাহিনির জটিলতা। মাছ মারার পদ্ধতি, সুদ, মহাজন কিংবা মনোবিকারই হোক, যেখানে বিবেকের দরকার সেখানেই এসেছেন তিনি। তবে আরোপিতভাবে নয়, যা এসেছে তা আপন গতিতে; গঙ্গার আবহে। অবশ্য এই গতি আর আবহ তৈরি, লেখকের কম বড় কৃতিত্ব নয়। আসলে সমরেশ বসু সমস্ত অলিগলি হাতড়ে উদ্ধার করেছেন 'গঙ্গা-সম্পদ'। উপভোগ করেছেন সেই জগৎকে, সেই জ্বালাকে। পাঠককেও করতে চেয়েছেন তাঁর সহচরী। করেছেনও। আর এই বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছেন বলেই হয়তো অবলীলায় বলতে পেরেছেন – এই শব্দ, ভাষা, উপমা, নিয়ম-নীতি, পূজা-অর্চনার কথা।সমরেশ বসুর অন্তর্দৃষ্টি এতটাই প্রখর যে, খানাখন্দের শেষ পর্যন্ত তিনি দেখতে পেতেন। দেখাতে খামতি রাখেননি কোনোদিনই। তবে তাঁর দেখার চোখ ছিল কাঁড়ার চেয়ে আকাঁড়ার দিকেই বেশি। যার প্রমাণ গঙ্গার অধিক আর কিছু হতে পারে না। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের একটি বিশ্লেষণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন – সমরেশ বসু ছিলেন এমন এক গোত্রের লেখক, যিনি তাঁর জীবন আর সাহিত্যের মধ্যে কোনো ভেদ রাখেননি। তিনি ছিলেন পুরোপুরি সৎ। সাহিত্যের ব্যাপারে কোনো ফাঁকি ছিল না। অজস্র চরিত্র তিনি দেখেছিলেন। তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে নিজের অভিজ্ঞতার ভান্ডার তিনি সমৃদ্ধ করেছিলেন। করেছিলেন বলেই তাঁর সমস্ত রচনাই ছিল একটির থেকে আরেকটি পৃথক।একই লেখায় তিনি আরো বলেছেন –শুধু গল্পের জন্য নয়, সমরেশ বসুর উপন্যাস যাঁরা ফর্ম, প্লট কনস্ট্রাকশন, টাইম ল্যাপসের কায়দা বোঝার জন্য সচেতনভাবে পড়বেন, তাঁরাই ধরতে পারবেন তাঁর মুনশিয়ানা। উপলব্ধি করতে পারবেন কত বড় মাপের লেখক ছিলেন তিনি। কত ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন, ভাষা নিয়ে, ডায়ালেক্ট নিয়ে, স্টাইল নিয়ে, ফর্ম নিয়ে। ('অদ্বিতীয়'; সমরেশ স্মৃতি)গঙ্গা কোনো ঢাউস উপন্যাস নয়। পুরো উপন্যাস রচিত হয়েছে মূলত এক মৌসুমের মাছমারার ঘটনা প্রবাহ নিয়ে। যদিও এর আগের মৌসুমের কথা আছে ভিন্নভাবে, যে-মৌসুমে নিবারণ সাইদর মরেছিল সমুদ্রে। তারপরেও গঙ্গার ঘটনা, কাহিনি, চরিত্র সব মিলিয়ে এর ব্যাপকতা এতই বেশি ছিল যে, এই উপন্যাস গায়ে-

গতরে হতে পারত বর্তমানের পাঁচগুণ। কিন্তু হয়নি। কারণ, সমরেশ বসু জানতেন, নিজেকে কতটা দিতে হয়, আর কতটা ধরে রাখতে হয়। আর তাই তো অজস্র দেখার মাঝ থেকে ক্রিম তুলে আনেন সহসাই। একবাক্যে অনেক কথা বলার ক্ষমতা তাঁর ছিল। ছিল বলেই তিনি অমর্ত্যের বউয়ের পুরো যৌবনকে একবাক্যে বলতে পেরেছেন – 'রাইমঙ্গলের জোয়ার এসেছে'। আবার হিমি হাজার মরীচিকা পাড়ি দিয়ে যখন বিলাসের বুকে মাথা গুঁজে একপশলা বৃষ্টির দেখা পেল, তখন লেখকের ছোট্ট কথা – 'আগনা ছুঁল ডাঙা'। যে-কথা বোঝাতে একটা বড় প্রস্তাবনা দরকার, সেখানে লেখক তিনটি শব্দকে যথেষ্ট মনে করেছেন। তাই বিশ্লেষকদের সঙ্গে আমাদেরও বলতে ইচ্ছা করে, গঙ্গা একটা বিশ্বনন্দিত ইংরেজি ছবির মতো। সময় দেড় ঘণ্টা। তবু মনে হবে, কতক্ষণ ধরেই না দেখছি। কত কাহিনি, কত ঘটনা, অথচ একটার সঙ্গে আরেকটার বড় পরম্পরা। তাই শুধু পটভূমিই নয়, এর ফর্ম, স্টাইল, ভাষা, কথোপকথন, সমাজচিত্র সবকিছু মিলেই সমরেশ বসুর গঙ্গা, অন্যান্য নদী-জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা রাখে। বাংলা সাহিত্যে জাল, জল ও জেলে জীবনের এই গৃহস্থালি আমাদের অহংকারী করে তোলে নির্দ্বিধায়। অন্যদিকে গঙ্গার শৈল্পিক সৌন্দর্য, স্বতন্ত্র বুনন আর কঠিন সংযমে আমরা বিস্মিতও বটে।

৯.২ গঙ্গা উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা

'নামকে যারা নামমাত্র মনে করেন আমি তাদের দলে' – মধ্যে কাব্যের উপেক্ষিতা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যখন এমন কথা বলেন, তখন বোঝা যায় যে, নামকরণ বিষয় টি রবীন্দ্রনাথের কাছে নান্দনিক। সাহিত্যে নামকরণ মূলত তিনপ্রকার –

১) নামভাবনা বা চরিত্র ভাবনা মূলক।

২) ঘটোনাধারা

৩) ব্যঞ্জনাধর্মী

নাম্ভাবনায় চরিত্র কেন্দ্রিক অর্থাৎ মূল চরিত্রই প্রধান তার কার্যক্ষমতায় পুরো উপন্যাসকে টেনে নিয়ে নিয়ে চলে – রাজসিংহ, গোরা, শ্রীকান্ত কোনো কোন উপন্যাসে

ঘটনার জন্য অরিত্রগুলো বেশি আকর্শিত হয়। চরিত্র গুলির দোষ ত্রুটিভালো মন্দ নির্ধারিত হয় ঘটনার জন্যই। এই ধরনের উপন্যাস বিশঢয় থেকে বিষয়ান্ততে যায়। যেমন – 'মামলার ফল, গৃহদাহ, কৃষঙ্কান্তের উইল'। আধুনিক সাহিত্যে ব্যঞ্জনা ধর্মী নামকরণের চলই বেশি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই ১৯০৩ সালে চোখের বালি নামকরণে ব্যঞ্জয়নায় প্রভাব আনেন। নামকরণে তিনি একটু বেশিওই সাবধানী। তাই নাটকে যক্ষ পুরী নন্দিনীর পর রক্তকরবী নামকরণ আসে। - সেটাও পুরো ব্যঞ্জনাময় মানিক বন্দ্যোপাধায়ের পুতুল নাচের ইতিকথা গোটা মানব জাতির ব্যঞ্জনার প্রতীক। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীও নামকরণে সিদ্ধ হস্যত ছিলেন। তাই আধা নাগরিক জীবনে একদল জুবতীর কর্মক্ষ্মতা কীভাবে বিপর্যস্ত করে সেই দিকে ব্যঙ্গ করে প্রথগম উপন্যাসের নামকরণ করেন সূর্যমুখী। একই রকম লালসা ও লোভ নূরজাহান সৃষ্টি করে, তার প্রমাণ মীরার দুপুর – কারণ মীরার সব পাপ দুপুরেই ঘটে। তবে তৃতীয় উপন্যাসে জ্যোতিরিন্দ্র আর ব্যক্তিতে বা নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ থাকলেই না । - তিনি একটি যুগ কে বলা ভাল বিবর্তনকে তুলে ধরলেন। তাই উপন্যাসটি হয়ে উঠল ব্যষ্টিবাচক নয় সমষ্টিবাচক – 'বারো ঘর এক উঠোন'।

পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, শিবনাথ মূল চরিত্র তাহলে উপন্যাসের নামকরণ শিবনাথের বাড়ি বদল হল না কেন? লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন পূর্বাশায় (তারিণির বাড়ি বদল বলে আমার একটা গল্প বেরোয়। আমি চিন্তা করে দেখেছি বারো ঘর এক উঠোন আমার সাহিত্য জীবন কিন্তু উপন্যাস টির শুধু শিবনাথের সমস্যা তো নয়ই আরো এগারো টা পরিবার শুদ্ধ বাংলা সমাজের সমস্যা। সেক্ষেত্রে নামকরণটি সার্থক হতো না। একই রকম প্রধান চরিত্র সুরুচি ও একটি ভারী চরিত্র। মীরার মতোই তার পদস্থলন হয়, সেক্ষেত্রে মীরার দুপুর উপন্যাসের নামকরণের মতো এই উপন্যাস অও ব্যক্তি কেন্দ্রীক হতে পারত। কিন্তু সেক্ষেত্রে অন্যান্য নারী চরিত্রগুলিকে অবমাননা করা হয়, তৃতীয় পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, উপন্যাসের নামকরণ গোষ্ঠী জীবন হলো না কেন, সেক্ষেত্রে বিওলা যায় বস্তির জীবন কাহিনী সব কালে সব স্থানে সমান নয়, সমরেশ বসুর বিটি রোডের ধারে উপন্যাসে মূল আলেখ্য বস্তি, কিন্তু

সেটা সম্পূর্ণ রাজনীতির দিকে মোর নেয়, সেই দিক থেকে সামগ্রিক বোঝাতে গঙ্গা উপন্যাস নামকরণ নদী কেন্দ্রিক জীবন যাত্রা ও নদীকেন্দ্রিক প্রতিবেশ ও চিত্রণে সার্থক হয়ে উঠেছে।কোনো নবাগত সাহিত্যিকের নিতান্ত অপরিচিত কোনো উপন্যাসের জন্য ভূমিকার প্রয়োজন হতে পারে। এ ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন বোধহয় নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। গঙ্গা উপন্যাসটি উৎসর্গ করা হয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি বলেছিলেন – 'ভালো লেখা, বড় ভালো লেখা'। বিষ্ণু দের মতো যশস্বী লেখক ও কবি সমালোচক আশীর্বাদ ও উৎসাহ জ্ঞাপন করে বলেছিলেন – 'গঙ্গায় আপনার যাত্রা' আপনাকে সাগরসঙ্গমে দেখতে চাই।' লব্ধপ্রতিষ্ঠ সমালোচক এবগ সমরেশ বসুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন – 'তাঁর সাহিত্যিক জীবনে 'গঙ্গা', একটা মেইল স্টোন্।'একালের শক্তিশালী সাহিত্যিক সমরেশ বসু সম্বন্ধে সেই একই কথা বোধহয় উচ্চারণ করা যায়। 'উত্তরঙ্গ' ও 'জগদ্দল' এর মতো এপিকধর্মী উপন্যাস, গঙ্গার মতো নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস, আবাব্র একই সঙ্গে বিবর প্রজাপতি পাতকের মতো বিতর্কিত উপন্যাস লিখে যিনি কিছুদিন আগেও আমাদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন, আজকের পাঠকের কাছে তিনি অতটা সজীব আছেন, এ বিষয়ে একটু অসবস্তি তো জাগেই। কাজেই আমাদের অলসচিত্তকে একটূ আন্দোলিত করার চেষ্টা করাটা মন্দ নয়, এই চিন্তা থেকেই প্রাথমিকভাবে ভূমিকা লেখার বাসনা।

দ্বিতীয় কথাটা এই যে, সমরেশ বসুর দীর্ঘ ঔপন্যাসিক প্রয়াসে গঙ্গা র একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্যও আছে। লেখকের নিজের রচনাধারাতে তো বটেই, বাংলা কথাসাহিত্যের ধারাতেও এই উপন্যাস তাৎপর্যপূর্ণ। সেই তাৎপর্য পরিস্ফুট করার চেষ্টা কেউওই করেননি, এমন কথা বলা যাবে না, কিন্তু যে পরিমাণে তা হলে আশ্বস্ত হওয়া যেত, সে পরিমাণে সেই করাটাও সাহিত্যিক দায় বলে বিবেচনা করেছি।

তৃতীয় কথা হচ্ছে, গঙ্গা উপন্যাসের অনবদ্য শিল্পরূপ। লেখাই ছিল সমরেশ বসুর জীবিকা। এই ধরনের জীবিকা যাঁদের গ্রহণ করতে হয় তাদের স্বাভাবিক কারণেই লিখতে হয় অনেক বেশি। সেদিক থেকে বিচার করলে এই উপন্যাসের সংযম ও সঙ্ঘতি আমাদের বিস্মিত করতে বাধ্য। তুলনা নিশ্চয়ই করছি না, করা সংগতও নয়,

কেবল কথাটা মুহূর্তের জন্য ঝলসে উঠছে – মনে যে, মালিনী নাটক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথও এই রকম একটা কথা বলেছিলেন – তাঁর এই নাটোকটি নাকি দেশকালের ধারায় সঙ্ঘত। আমার মনে শিল্প সিদ্ধির ব্যাপারটা গঙ্গা উপন্যাসে এতটাই উন্নত মানের, যে তা বার বার আলোচিত হবার মতো। কাজেই এর শৈল্পিক গঠন এবং কঠিন সংযম কিছুটা বিশদভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

এইগুলিই মোটামুটিভাবে সেই কারণ জাতে মনে হয়েছে, সমরেশের অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যেও গঙ্গা একতু স্বতন্ত্র। যে পাথক এই উপন্যাসটি পাঠ করবেন, বোধহয় এর শৈল্পিক সৌন্দর্য এব্বং স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে একটু অবহিত হয়ে পাঠ অগ্রসর হওয়া ভালো। এর আর একতা উপযোগিতাও আছে। আমাদের প্রথাগত ভোজনবিধিতে বলে, অত্যন্ত উতকৃষত ও উপাদেয় খাদ্যগ্রহণের প্রথম পদ থাকে শুক্তো। তিক্ত খাদ্য দিয়ে শুরু করলে পরবর্তী পদের স্বাদুতা আরো বৃদ্ধি পায়। সেই কারণেও আমার তিক্ত স্বাদবিশিষ্ট ভূমিকাটিকে সহ্য করে নেবার আবেদন জানাতে পারি, এতে মূল আস্বাদের উপভোগ্যতা আরো বৃদ্ধি পাবে বলেই আশা করি।

সমরেশ বসুর গঙ্গা উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালের শারদীয় সংখ্যা জন্মভূমি পত্রিকায়। উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ হলে তা তিনি উৎসর্গ করেছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং বেশ কিছু মতসজীবী বন্ধুর কাছে তিনি ঋণস্বীকার করেছিলেন, যাঁদের মধ্যে প্রথম ছিলেন হালিশহরের রামপ্রসাদ লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক নিমাই চাঁদ অধিকারী।

গঙ্গায় মাছমারা জেলে সম্প্রদায়কে নিয়ে লেখা উপন্যাস, কিন্তু তাঁর তথ্য সংগ্রহের জন্য কী গভীর আগ্রহে খুঁটিনাটি সমস্ত কথা সমরেশ জেনে নিতেন নিমাইবাবু এবং তাঁর পিতার কাছ থেকে সে বিষোয়ে প্রচুর জানা যায় নিমাইবাবুর ‘সমরেশদার গঙ্গা ও আমরা প্রবন্ধ থেকে। এটি প্রকাশিত হয়েছিল সমরেশ বসুঃ স্মরণ সমীক্ষণা’ গ্রন্থে। তাঁর প্রবন্ধ থেকে সংগত কারণেই একটু দীর্ঘ অংশ উদ্ধার করতে হবেঃ

‘প্রায়ই আসতেন এবং গঙ্গায় মাছধরাদের নিয়ে হাজার প্রশ্ন করতেন। কোনো সময় হয়তো প্রশ্নঃ আচ্ছা, গঙ্গায় ইলিশ মাছ ধরার জন্য কী কী জাল ব্যবহার করা হয়? বাবা

হয়তো তাঁর উত্তরে বললেনঃ বাঁধা ছাঁদি, কোণা জাল, খুটে জাল এবং সাংলো জাল। আবার প্রশ্নঃ বাঁশের চোঙ্গার মতো যেটি জলের উপর ভাসে, সেই শোলা থাকে কোন্ কোন্ জালে। বাবার উত্তর, টানা ছাঁদি ও কোণা জলে। আবাব্র প্রশ্নঃ ওগুলো কিসের এবং কী কারণে। উত্তরে বাবা বললেন – ওগুলো ফাঁপা বাঁশের এবং বাঁশের ! ... আর খুঁটে জালে কোনো শোলা লাগে না, কারণ তিঞ্চারটের দশ হাতি বাঁশ দিয়ে ফাঁক করে রাখা হয়। আর সাংলো জাল দুটো বাকারির সাহায্যে সাজানো হয় ও তারপর সরু দড়ির দ্বারা জালটাকে ফাঁক করা হয় এবং সেটি স্রোতের টানে ভেসে চলে। ...'

নৌকায় বসে তাঁর হাজার প্রশ্ন। আপনাদের নৌকা এত সরু এবং লম্বা কেন? এতে করে কী সুবিধা, এই টাইপের নৌকা করতে কতগুলো তক্তা লাগে; গুঁড়ো কাকে বলে; নৌকার সামনেটাকে কী বলে; যেখানে বসে হাল বাইতে হয় সেদিকটাকে কী বলে? ...

সমরেশদার আবার প্রশ্নঃ ইলিশমাছ ধরার সময় চলে গেলে অর্থাৎ শীতকালে জেলেরা গঙ্গায় কী কী মাছ ধরে এবং কী কী উপায়ে? উত্তরে জানাই, বিশেষ করে সে সময় তারা চুনো মাছ ধরার বিন্জাল পাতে। একে কেউ বিন্তি। বিউতি জালও বলে। ... এ জালের আকারটা খুব সুন্দর। মানুষের মতো এর দুটি হাত আছে। মুখটাকে দুটি দশহাতি বাঁশ দিয়ে ফাঁক করে রাখা হয়। আর বডিটার শেষ সীমায় দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। স্রোতের টানে সেখানে গিয়ে মাছগুলো জমা হয় বা আটকে যায়। ... ইলিশ মাছ ধরার জাল বা চুনো মাছ ধরার জাল – সব কিছু কোটাল নির্ভর। জোয়ান কোটালে বেশি মাছ পড়ে, মরা কোটালে সেই অনুপাতে খুব কম...

সমানে চলল তাঁর নোট নেওয়া। তা প্রায় ৩/৪ বছর হবে। মাছধরাদের একটা নিজস্ব ভাষা আছে...পেশার সাথে ভাষার এত মিল সমরেশ বসুর প্রশ্ন করার আগে সেই অর্থে কোনো সাহিত্যিক তোলেননি। গঙ্গায় সেই সব শব্দের প্রতিফলন ঘটেছে।

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি গ্রহণ করার কারণ শুধু এইটুকু বোঝানো যে একজন মহৎ শিল্পী যখন বিশেষ একটি উপন্যাস রচনার জন্য বিশেষ একটি জনপদ বা বিশেষ জনসম্প্রদায়কে গ্রহণ করেন, তখন তা স্বরবাংশে জানার চেষ্টাও তিনি করেন – সাহিত্যের শৌখিন মজদুরি তাঁর জন্য নয়। বিদেশে এই ধরনের ঔপন্যাসিক প্রচেষ্টার কথা আমরা জানি।

'গুড আর্থ' উপন্যাসটি রচনা করার জন্য নোবেল-বিজয়িনী ঔপন্যাসিক পার্ল এস্ বাক্‌কে নাকি দীর্ঘদিন চীনে গিয়ে বসবাস করতে হয়। এদেশে সাম্প্রতিক কালে মহাশ্বেতা দেবীর এই প্রশংসনীয় প্রয়াসও অবশ্য উল্লেখ করবার মতো। কিন্তু তাঁর অনেক আগে সমরেশ বসুর এই আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা, শিল্পের প্রতি, লক্ষ না করে উপায় নেই। উপন্যাসটির একটি সচেতন পাঠই দেখিয়ে দেবে সযত্ন – আহরিত এইসব তথ্যকে কত সুচারুভাবে ঔপন্যাসিক প্রয়োগ করতে পেরেছেন।

অথচ সাধারণভাবে দেখতে গেলে গল্পাংশে যে এমন কিছু অভিনব, তা বলা যাবে না। দক্ষিণের মাছমারাদের গল্প, অর্থাৎ কিনা মৎস্যজীবী। এদের মধ্যে অনেক জাতই আছে – 'জেলে, কৈবর্ত, নিকিরী, চুনুরী, মালা সবাই আসছে।'ওদিককার রাজবংশীরাও কালে কালে মাটি হারিয়ে মৎস্যজীবী হয়েছে। তারাও আসছে। ইলিশ মাছের মরশুমে মাছধরা নৌকার ভিড় লেগে যায় দক্ষিণ অঞ্চলে। পাইকারি খরিদ্দারও সব ঠিক করা আছে অনেক মাছমারার। এদের মধ্যেই কিছু কিছু মাছমারার স্বপ্ন থাকে সমুদ্রে যাবার। বড় ভয়ঙ্কর সে যাত্রা, তবুও দুঃসাহসী সেই স্বপ্ন থাকে সমুদ্রে যাবার। সেই স্বপ্ন যার উকে ছিল সেরকম একজকে নিয়েই এই উপন্যাস, নাম তাঁর বিলাস, তেঁতলে বিলাস। ধলতিতায় বাস তাদের। তাঁর বাপ নিবারণেরও ছিল ঐ সমুদ্রের স্বপ্ন। সমুদ্রে যে মাছমারা অভিযান চালায় তাকে বলে সাঁইদার, নিবারণ ছিল সাঁইদার। জলেই দিতে হয়েছে প্রাণ তাকে, তাঁর দুঃসাহসের খেসারত্ হিসেবে। অবশ্য দুঃসাহসী হবে নাইবা কেন, মালোদের প্রথম পুরুষ সুন্দরবনের দক্ষিণরায়ের চেলাদের সঙ্গে লড়াইয়ের সাহস দেখিয়েছিলেন, লড়াইয়ে জিতেছিলেন। কতদিন আগে ঘটেছিল সেই ঘটনা? 'চোদ্দ পুরুষেরও চোদ্দ পুরুষ আগে। ...দিগবর কালো কুচকুচে এক পুরুষ, কোঁচকানো চুল ফণা ধরে আছে কপালের ওপর। গাঁয়ে আর কিছু নেই। হাতে এক মস্ত ক্যাঁচা। ডাঙায় এসে ওয়ার বড় বেপদ হল। দক্ষিণরায়ের রাজ্যি। ছেড়ে কি কথা কয়। ... আসার পথে লড়ুই হল দক্ষিণরায়ের চেলাদের সঙ্গে। জিতলেন উনি। দক্ষিণরায় খুশী হয়ে মস্ত একখানি গাঁয়ের ছাল দিলেন ওয়াকে পরতে। নিবারণের ছেলে বিলাস মাছ মারতে শিখেছে কাক পাচুর সঙ্গে। পাইকার দামিনীর সঙ্গে পরিচয় হল তাঁর, ভাব-ভালোবাসা হল তাঁর নাতনি হিমির সঙ্গেও। নদীর বুকেই মৃত্যু ঘটল একদিন পাঁচুর, বলে গেল

হিমির সঙ্গে মেলামেশায় কোনো আপত্তি নেই তাঁর। হিমি বিলাসের মিলন ঘটল অবশেষে। কিন্তু মন যার পড়ে আছে সমুদ্রে, হিমির বাহুবন্ধনও কি তাকে বাঁধতে পারে! সুতরাং উপন্যাসের শেষ হয় এইভাবেঃ

'ঢেউ লেগেছে রাইমঙ্গল আর ঝিল্লের মোহনায়। কালীনগর গঞ্জ থেকে চাল ডাল নুন তেল যোগাড়যন্ত্র হয়েছে। সাঁইদারের অপেক্ষা।

সাঁইদার কে?

বিলেস। তেঁতলে বিলেস।'

তেঁতলে বিলেস সমুদ্রে যায়।

এই তো গল্প। এই সামান্য উপকরণ নিয়ে কী অসামান্য উপায়ে সমরেশ বসু এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি সম্ভব করলেন, উপন্যাসের অসাধারণত্ব কোথায়ই বা সেসব বুঝতে গেলে জলজীবন নিয়ে লেখা কয়েকটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের কথা আমাদের মনে করতে হবে। তাতেই এর সামর্থ্যের কিছু আভাস পাওয়া যাবে বলে মনে হয়।

৯.৩ জলকেন্দ্রিক উপন্যাসের সঙ্গে সমরেশ বসুর গঙ্গার সংযোগ

নদী আর মাছমারাদের নিয়ে দুটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস লেখা হয়েছিল গঙ্গার আগে, বাংলাভাষায় অবশ্যই একটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানন্দীর মাঝি অন্যটি অদ্বৈত মল্লবর্মনের তিতাস একটি নদীর নাম। ইংরেজিতে লেখা হয়েছিল আর একটি হেমিংওয়ের লেখা – ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দা সী। নোবেল পুরস্কার পেয়েছিল ১৯৫৪ সালে। পদ্মানদীর মাঝি জেলে জীবনেরই অন্তরং কাহিনি। সেখানে প্রতিরোধের চিত্র কেবল একটি অসাধারণ চরিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যার নাম হোসেন মিয়া। পদ্মা তাঁর মতো তাঁর মীন সন্তানগুলিকে লুকিয়ে ফেলবে। এই পরনির্ভরতা মানতে হোসেন মিয়া প্রকৃতপখে পদ্মানদীর মাঝি হোসেনকে বলা হয়নি, বলা হয়েছে কুবেরকে – কারণ কেতুপুর অঞ্চলের সমগ্র ধীবরজাতিরই প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য হতে পারে সে। ধীবরজাতির এই অসহায়তা, দারিদ্র্যের জ্বালা, ছোটখাট স্বার্থপরতা এবং তাঁর মধ্যেই

বেঁচে থাকা কিছু কোমলবৃত্তি নিয়ে এই সমাজ জীবন্ত হয়ে উঠেছে উপন্যাসে – এ কথা স্বীকার করতেই হবে। মূলত জৈব প্রকৃতির এই মানুষগুলিকে আঞ্চলিক উপাদান ো তাঁর বৈশিষ্ট্য। তাঁর অন্য বৈশিষ্ট্য, বিশিষ্ট জীবনদৃষ্টিতে উপন্যাসটি অভিষিক্ত করা এবং তৃতীয় বৈশিষ্ট্য, অসাধারণ সংযম। এই সব নিয়ে পদ্মানদীর গল্প, কুবের মালা কপিলার গল্প আমাদের নাড়া দেয়, কোনো সন্দেহ নেই। এমনকি কপিলা চরিত্রের মধ্যে যাকে দেখতে পেয়েছি, 'পুতুলনাচের ইতিকথা'-য়।সংক্ষিপ্ত পরিসরে সামগ্রিক ভাবে সম্প্রদায়ের গল্প শোনানো যদি 'পদ্মানদীর মাঝি'র বৈশিষ্ট্য হয়, তবে নিজেকে সম্পূর্ণ অন্তরালে রেখে গল্প না শোনানোর এক ভঙ্গির জন্যই স্মরণীয় অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাস তিতাস একটি নদীর নাম। এই উপন্যাসেও মালো শ্রেণীর ধীবর জাতির আখ্যান, কিন্তু আখ্যান বললে যেন অস্ত্য বলা হয় – যেন কোনো আখ্যান রচনার চেষ্টাই করেননি অদ্বৈত মল্লবর্মন, তাঁর কাজ যেন শুধু ত্তাসের গল্প শোনানো। মোটামুটি সম্পন্ন নদী তিতাস – তাঁর কুলজোড়া জল, বুকভরা ঢেউ, প্রাণভরা উচ্ছ্বাস। স্বপ্নের ছন্দে সে বাহিয়া যায়। অর্থাৎ একটি সজীব নদী। নদীই যেন লেখকের বর্ণনীয়, নদীই যেন অপ্রধান চরিত্র – যে নদী নারীর মতোই উচ্ছবসিত, বিজয়া নদীর দারিদ্র্য ো অপ্রতুলতা যার নেই।

কাহিনী গ্রন্থণে সম্পূর্ণ অনাগ্রহই 'তিতাস একটি নদীর নাম'-কে এক ব্যতিক্রমী উপন্যাসে পরিণত করেছে। নদীবক্ষে বসে নৌকা যখন এগিয়ে চলে, দুপাশে জনপদের ছবি দেখা যায়, মানুষজন দেখা যায়, তাদের ঘর-গৃহস্থালীর দেখা যায়। এদের সঙ্গে পরিচয় ঘতেনি কখনো, সম্পূর্ণ পরিচয় এই ক্ষণীক দেখায় গড়েও উথোবে না – তাদের জীবনের একটি মুহূর্তই শুধু আঁকা থাকবে মনের মধ্যে, পরবর্তী পরিণতি জানবার কোনো উপয়ায় নেই। কারণ নদীর জল তখন সামনে বয়ে গেছে অনেক – এই ভঙ্গিটিই লেখক ব্যবহার করেছেন। নতুবা সমগ্র উপন্যাসকে তিনি এমন নির্দিষ্ট ছকে বিন্যস্ত করতে পারতেন না। উপন্যাসটিকে স্পষ্ট চারটি ভাগে লেখক বিভক্ত করেছেন, প্রত্যেক ভাগের আবার দুটি করে অধ্যায়। একেবারে প্রথম ভাগের প্রথম অধ্যায়ের নাম তিতাস একটি নদীর নাম। সেখানে গল্পের বিশেষ আয়োজন নেই, সেখানে তিতাস

সিঞ্চিত অঞ্চলটির জীবনধারার একটা আভাস দেওয়া। গল্প কিন্তু স্পষ্টতই শুরু হয়ে যায় ‘প্রবাস খন্ড’অধ্যায়ে। দীননাথ মালোর মেয়ে বাসন্তী, মাঘমন্ডলের ব্রত এবং চৌয়ারি উৎসব আর দুই তরুণ কিশোর ো সুবলের প্রতিজোগিতার মধ্য দিয়ে গল্পটা তৈরি হয়ে যায়। প্রবাস খন্ডেই কিশোর সুবলের প্রবাসে যাবার প্রস্তুতি ো যাত্রা। সেখানে গিয়ে ঘটনা অনেক ঘটে। শুকদেবপুরের সঙ্গে অদৃশ্য বন্ধনে আটকে যায় কিশোর। মোড়লের মেয়ের সঙ্গে তাঁর মালাবদল হয়, কিন্তু ফেরার পথে ডাকাতের দল পড়ে নৌকার ওপর। কিশজোরের স্ত্রীকে পাওয়া যায় না। যখন পাওয়া যায় পরের দিন, তখন সে মৃত। বিকৃত দেহ, কিন্তু ধরেই নেওয়া হয় সে কিশোরের বউ। কিশোর পাগল হয়ে যায়।

দ্বিতীয় খন্ডের শুরু বছর চারেক পরে। এখানেও দুটি খন্ড – নয়া বসন্ত এবং জন্ম মৃত্যু বিবাহ। নয়া বসতে জানি, একটু রহস্যময়তা নিয়েই অবশ্য, কিশোরের বউ মরেনি, ছেলে অনন্তকে নিয়ে গ্রামেই সে ফিরে এসেছে – কিন্তু সকলের কাছেই মৃত বলে নিজের পরিচয় সে দেয় নি। পাগলা কিশোরকে দেখে কিছু হয়তো সে বোঝে, সামান্য জীবিকা অবলম্বন করে সে পাগল স্বামীর কাছেই একটি বাড়িতে বাসা বাঁধে। দ্বিতীয় খন্ডের পরের অধ্যায় ‘জন্ম-মৃত্যু-বিবাহে’অনেক ঘটনা ঘটে যায়। এক দোলের দিন স্পষ্ট করে বোঝে অনন্তর মা, পরের দোলে তাকে রঙ মাখাতে গিয়ে বিপরীত ফল ফলে। পাগল তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে আরম্ভ করে। লোকের মারে পাগলের জীবন যায়, চারদিন পরে অনন্তর মা-ও মারা যায়।

তৃতীয় খন্ডের প্রথম অধ্যায়ের নাম রামধনু পরের অধ্যায়ের নাম রাঙা নাও। প্রায় ভিন্ন এসে যায় এখানে। মায়ের মৃত্যুর পর বাসন্তীওই প্রায় অনন্তর অভিভাবিকা। কিন্তু বনমালী জেলের সঙ্গে খাতির করে অনন্ত তাঁর বোনের সঙ্গে তাদের গ্রামেই চলে যায়। মধ্যে ঘটে মালোপাড়ার সঙ্গে তেলিপাড়ার রেষারেষি। অনন্তর জীবনে এইভাবে আসে ক্রমে মা, বাসন্তী, বনমালী, বোন উদয়তারা। দ্বিতীয় অধ্যায় রাঙা নাও। প্রতিযোগিতার জন্য রাঙা নাওয়ের গল্প দিয়েই শুরু হয় বটে, কিন্তু শেষ হয় অনন্তর অধিকারকে কেন্দ্র করে বাসন্তী এবং উদয়তারার হিংস্র কলহে।

চতুর্থ খন্ডের দুটি অধায়ের নাম দুরঙা প্রজাপতি এবং ভাসমান। এখানে গ্রাম্য দলাদলি বাদ দিলে যে কথাটি থাকে সেটি হল, অনন্ত লেখাপড়ায় মন দিয়েছে গোঁসাই বাবাজির কাছে। সহপাঠিনী অনন্তবালার সঙ্গে বিয়ের কথা হয় তাঁর, কিন্তু তাঁর মন তখন শহরে যাবার স্বপ্ন দেখে। মালোদের নিজস্ব সংস্কৃতি ভেসে যাচ্ছে, এদিকে যাত্রা ো হটিয়ে দেবে, এমন আভাসও যেন পাওয়া যায়। ভাসমান অংশে এই আশঙ্কা সত্য হয়ে ওঠে – সর্বনাশকে সম্পূর্ণ করে তিতাসের জল শুকিয়ে যাবার মতো অসম্ভব ঘটনা। তিতাসের শুকিয়ে যায়, মালোদের জীবনও ফুরিয়ে আসে। তিতাসের চর জেগেছে, ধান হয়েছে। কিন্তু এই ধানই মালোদের শত্রু। শেষ দৃশ্যে ভাতের জন্য থালা হাতে বাবুদের কাছে দাঁড়াতে দেখি বাসন্তীকে, কিন্তু বাবু যে অনন্ত সে কথা জানার পরই সে পালিয়ে আসে।

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে মানুষের গল্প নেই বলা ভুল, কিন্তু মূল গল্পটা আসলে তিতাসেরই। অথবা বলা যায়, তিতাসের ওপর নির্ভরশীল একটি জনগোষ্ঠীর। জল সরে গিয়ে চর জাগলে, চাশ আবাদ হলে আমরা আশার আলোই দেখতে পাই, কিন্তু তিতাস-নির্ভর মালো সংস্কৃতি সেখানে আশাহত হয় এই কারণে যে জল দেখতে পাই, কিন্তু মালোও থাকে না। অনন্ত লেখাপড়া শিখে মানুষ হয় বটে, কিন্তু সে আলাদা গল্প – সে গল্পটা এখনো শুরুই হয়নি, তিতাস সে গল্প শোনাতে পারে না, আমরা জেনে গেছি, কারণ তিতাস অপরাজিত নয়।

গঙ্গা উপন্যাসের প্রসঙ্গে অন্যান্য নন্দীকেন্দ্রিক উপন্যাসের প্রসঙ্গ আমরা স্মরণ করছি কেবল এই জন্যই যে গঙ্গা উপন্যাসের অনন্যতা আমরা দেখতে চাই। অন্যত্র সেখানে আরো কিছু আছে – আরো অনেক বড় কিছু। তিতাস একটি নদীর নাম – এ সে জিনিস নেই, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইছামতী তে নেই, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের কাঁদো নদী কাঁদো'তে নেই – এমনকি জর্জ এলিয়টের দি মিল অন দি ফ্লস উপন্যাসেও জীবন সংগীত। কাঁদো নদী কাঁদো তে তিতাসের মতোই বাঁকাল নদী মজে যাওয়ার সঙ্গে ঝুমুরডাঙার মানুষগুলির করুণ দুর্দশার কথা আছে। দি মিল অন দি ফ্লস অবশ্য জনসমষ্ঠির গল্প নয়, কিন্তু সেখানেও একটি পরিবারের করুণ অপচয় ফ্লস নদী অনেকটা উদাসীন দর্শকের মতোই বসে দেখছে।

গঙ্গা উপন্যাসে আমরা ঠিক সে জিনিস পাইনি। গঙ্গা মাছমারাদের গল্প, কিন্তু শুধু গঙ্গানদীতে ইলিশের মরসুমে মাছমারাদেরই গল্প নয়। গঙ্গায় আপনার যাত্রা, আপনাকে সাগরসঙ্গমে দেখতে চাই – বলেছিলেন বিষ্ণু দে। এক অর্থে ঠিকই বলেছিলেন, গঙ্গা উপন্যাসের আরম্ভ কিন্তু সাগরসঙ্গমের স্বপ্নেই তো উপন্যাসের উত্তরণ। এই সাগরস্বপ্ন আছে বলেই তো বিলাস ছটফট করে, তাঁর বাপ ছিল সাঁইদার – যে সমুদ্রযাত্রা বিলাস জীবনের চরম সফলতাতেও সন্তুষ্ট নয়, মহারাণীর হৃদয় জয় করেও সে থেমে থাকতে পারে না গঙ্গার সীমিত তরঙ্গে, মহারানীর মনকে বুঝিয়ে তাকে যাত্রা করতে হয় সমুদ্রের দিকে – 'তেঁতলে বিলেস সমুদ্রে যায়।'

৯.৪ অনুশীলনী

১) গঙ্গা উপন্যাসে কাহিনি চিত্র পট সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২) গঙ্গা উপন্যাসের কাহিনিতে গঙ্গার যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা আলোচনা কর।

৩) গঙ্গা উপন্যাস ব্যতিরেক বাংলা সাহিত্যে অন্যান্য নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসের চিত্র কিভাবে উঠে এসেছে আলোচনা কর।

৪) গঙ্গা উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা আলোচনা কর।

৯.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১) গঙ্গা সমরেশ বসু – মৌসুমী পাবলিকেশন।

২) বাংলা সাহিত্য পরিচয়, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তুলসী প্রকাশন।

৩) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দেবেশ কুমার আচার্য, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি।

একক-১০ গঙ্গা উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণ ও অপ্রধান চরিত্রের গুরুত্ব আলোচনা

বিন্যাস ক্রম

১০.১ গঙ্গা উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণ ও অপ্রধান চরিত্রের গুরুত্ব আলোচনা করঃ- (পাঁচু, নিবারণ, বিলাস)

১০.২ অনুশীলনী

১০.৩ গ্রন্থপঞ্জি

১০.১ গঙ্গা উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণ ও অপ্রধান চরিত্রের গুরুত্ব আলোচনা করঃ- (পাঁচু, নিবারণ, বিলাস)

জলের সঙ্গে মানুষের এই সংগ্রাম, এই মধুর প্রতিদ্বন্দ্বিতার চিত্র পাই না আমরা অন্য কোনো নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসে, অন্তত এমনি করে। তিতাসকে অবলম্বন করেও মানুষ হিসাবে হয়তো বেঁচে ওঠা যায়, অনন্ত তাঁর প্রমাণ, কিন্তু সেই কল্পবীজ এ উপন্যাসে শাখায়িত হতে পারেনি। হোসেন মিয়া ময়নামতীর দ্বীপে পদ্মার প্রতিস্পর্ধী এক জনবসতি গড়ে তুলতে চেয়েছে, কিন্তু তাঁর সে প্রয়াসও রহস্যময় থেকে গিয়েছে। কিন্তু গঙ্গার বুকে মালো পরিবারের মাছমারা ছেলে সমুদ্রের স্বপ্ন এমন ভাবে লালন করেছে মনের মধ্যে, প্রতিহত করা যায় নি তাকে। গঙ্গাকে এইভাবে পেরিয়ে যেতে পারে বলেই গঙ্গা এই জাতীয় উপন্যাসগুলির মধ্যে স্বতন্ত্র।

লেখকের জীবনদৃষ্টি এবং উপন্যাসের থিম ফুটিয়ে তুলতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে উপন্যাসের চরিত্র। যে কারণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চোখের বালি উপন্যাসে বার বার বিষবৃক্ষ উপন্যাসের উল্লেখ করা সত্ত্বেও আমরা বুজে যাই, দুটো ঠিক এক ধরনের উপন্যাস নয়- কাঠামোটা অনেকটা একরকম থাকলেও; সেই দুই পুরুষ এক নারী অথবা দুই নারী এক পুরুষের ত্রিভুজ কাহিনি ভাগ। মূল বক্তব্যটা আলাদা হয়ে যায়

মুলত বিনোদিনী চরিত্রের জন্যই, আমরা গল্প সামান্য এগুলোই বুঝে ফেলি বিনোদিনী একেবারেই কুন্দনন্দিনী নয়, এমনকি রোহিনিও নয়। কুন্দনন্দিনীর মতো নীরব দহন তাঁর জন্য নয়, রোহিনীর মতো অসূয়া তাঁর নয় – সে একটা চরিত্র, আরো ভালো করে বলতে গেলে, একটা নারী ব্যক্তিত্ব। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে মহেন্দ্র বিহারী রাজলক্ষ্মীকে শুধু নয়, আমাদেরও ভালো করে ভাবতে হবে। কাজেই গঙ্গা উপন্যাসের চরিত্রগুলিকেই লক্ষ করা যাক একটু ভালো করে। প্রথমে অবশ্যই বিলাস। বিলাসের পরিচয় দেবার আগে বলে নেওয়া হয়েছে তাঁর বাপের বৃত্তান্ত। নিবারণ সাঁইদার, ডাকাবুকো মালো মাছমারা, সমুদ্রে গিয়েছিল সে। দক্ষিণে গিয়ে, দুঃসাহস দেখাতে গিয়ে যখন তাঁর প্রাণ যায়, বিলাস তখন মায়ের গর্ভে, কিংবা সদ্যোজাত। এরপর বিলাসের প্রতজম বিবরণ এসেছে এইভাবে – দাদার বড় ছেলে। নাম বিলে। তেঁতুলে বিলেস, অর্থাৎ তেঁতুলতলার বিলাস। যেন দ্বিতীয় নিবারণ মালো। এমনি চেহারাখানিই ছিল দাদারও। কালো কুচকুচে রঙ, পেটানো শরীর। নেহাইয়ের মতো শক্ত। যেন নিমকাঠের কালো রঙ মাখা চকচকে মূর্তি। নাকটি ছোট। চোখদুটি ঈষৎ গোল। ভ্রু কুঁচকে মুখ তুলে তাকালে মনে হয়, কেউটে সাপ যেন ফণা ধরে আছে।

বিলাসের প্রকৃতি হিসাবে বলা হয়েছে, সবাই জানে, বড় রগচটা আর গোঁয়ার। গাঁয়ে শক্তিও তেমন। গাঁয়ের জোরের প্রমাণ দিয়েছে বিলাস বাছাড় হয়ে, অর্থাৎ চার পাঁচ মণের তালগাছের গুঁড়ি একদিকে ধরে সবচেয়ে বেশি দূর টেনে নিয়ে গিয়ে। আর দুই চড়। মুখের ওপর স্পষ্ট কথা স্পষ্ট করে শুনিয়ে দিতেও সে অস্তাদ। সেটা বোঝা যায়, মহাজনের কাছে চাইতে গিয়ে না পাওয়ায়। একবার চেয়ে না পেলে মহাজনকে কাকুতি মিনতি করাই সাধারণ নিয়ম, কিন্তু বিলাস বলেছিল, তবে আর মরতে মহাজন হওয়া কেন? মাছ হয়ে জন্মালেই হত?

বিলাসের চরিত্র আর একটি স্পষ্ট করে ফোটাতে পেরেছেন লেখক অমর্তর বউ অর্থাৎ অমৃতর বউয়ের সঙ্গে তাঁর আচরণ প্রসঙ্গে। অমৃত চিরকালের রুগী, তাঁর সঙ্গে মালোর ঘরের জাহাবাজ খান্ডার মেয়ে'র বিয়ে হয়েছে শুধু স্বামীর টাকার গুণে। কিন্তু স্বভাবে একেবারেই জৈব চরিত্রের এই মেয়ে কি শুধু টাকার ভোলে? তাই শরীরের ক্ষুধা দূর

করার জন্য সে মেয়ে লাগলে বিলাসের পেছনে? শরীরের বিচিত্র ভঙ্গি করে যৌন আবেদন সৃশটি করে দাঁড়ায় এসে সামনে, বিলাস নিজেকে সামলে দূরে যেতে গেলেই ঠাট্টা করে, 'খ্যামতা আছে?'

একদিন সহ্যের বাঁধ গেল টুটে – 'বিলাস কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো তাঁর হাত ধরে ফেলে বলল, পালাচ্ছ কেন, কাঁটার গুণ দেখে আও। বলে টেনে নিয়ে ফেলল গোয়ালের বিচুলিগাদার অন্ধকারে।...'

রাইমঙ্গলের জোয়ার এসেছে তখন, জত হাজা মজা ফানি ন্যাকড়া নদীর ঝুঁটি নেড়ে, ফেলে বল, পালাচ্ছ কেন, কাঁটার গুণ দেখে যাও। বলে টেনে নিয়ে ফেলল গোয়ালের বিচুলিগাদার অন্ধকারে...।

এ জন্যে একতা অপরাধবোধ অবশ্য বিলাসের আছে। এ রকম জৈব মানুষের মনে সেটা থাকা খুব স্বাভাবিক নয়, কারণ অমৃতর বউয়ের হালচাল দেখে সয়ারাম নিজেই বলেছে বিলাসের কাকা পাঁচুকে, 'ছেলে তোমাদের হয় হাঁদা নয় তো ভগবান। গাঁয়ের অন্য ছেলে হলি কবে সে, অমর্তর ঘরে রাত কাট্টে আসে।'

অথচ বিলাস এই কাজটা করার পর কেন যে গুমরে গুমরে মরে, স্যারামের চোদ্দ পুরুষের তা বোঝার ক্ষমতা নেই। সে একবার বলে, 'কাজটা আমার ভালো হয়নি', আর একবার বলে, 'বড় ঘেন্না করছে নিজেকে।' আবার কখনো – 'বুকটা বড় খালি মনে হয়। অমর্তের ভিটের ধারে আমার চোখ তুলে চাইলেও মন করে না। কিন্তু আমার শরীলে কী জ্যানো গইড়ে বেড়াচ্ছে। ঐ যেমন পদ্মাপাতায় জল তলমল করে, তেমনি। আমার বুকের ভিতরে ভিতরে। আমি বসতে শুতে টাল সামলে বেড়াচ্ছি।আমার মন, আমার শরীল যেন কে বেঁধে রেখেছে। আমার কি হয়েছে। আমি ছারান চাই। ছাড়ান অর্থাৎ মুক্তি চাই।'

বোঝা যায়, বিলাসের মধ্যে এমন কিছু আছে যা পাঁচটা মালো মাছমারার নেই। একদিক থেকে দেখতে গেলে পাক্কা মাছমারার সব গুণই তার আছে, সবই সে শিখেছে পাঁচু মারফত, কিন্তু অন্য অনেক ব্যাপারে সে আলাদা। মহাজনকে সে খাতির করবে

না, পঞ্জিকার বিধান অভ্রান্ত বলবে না, কোনো অন্যায়ের সঙ্গে আপস করবে না। এ জন্যে কাকা গালমন্দ, মারধর পর্যন্ত করে, কিন্তু স্বভাব শোধরাবার নয়। সহজ সরল সত্যগুলোকেও বিলাস বোঝে, এটাও তার দোষ। এ জন্যেও কাকার কাছে গাল কম খায় না। মহাজনের ঋণ শোঢ না করলে সে মাছধরার উপকরণ কেড়ে নেবে সে, এটাই সনাতন প্রথা। এ প্রথাটাও বিলাস মানতে চায় না, বলে 'আরে আমার আইন রে! আমার নৌকা জাল রেখে দেবে, তবে আর কি! তার চে' ঋণ নেব না। আমাকে ঋণ দে' তো মহাজন খায়। আমি যদি ঋণ না নে খেয়ে মরি। মহাজন বাঁচে কমনে? ঋণের জোরেই তো?

বিলাস এইরকম কথা বলে অবাক করে পাঁচুকে, রাগিয়েও দেয় প্রচণ্ড। অবশ্য মনে মনেও কিছু কথা বলে বিলাস। জলে মাছ ধরলে ট্যাক্স দিতে হবে, এ ব্যবস্থার ওপরও তার রাগ – 'যে দৌলত তুমি দাওনি, আমার বাপ-পিতামোর কৌশল খাটিয়ে যাকে পাই, তার ওপরে তোমার খবরদারি। নির্যাতন কুবে তুমি। কেন? না, আমি মাছ মারি। তোমার শক্তি আরো বড়, তুমি আমাকে মার।'

গঙ্গা উপন্যাসে আমরা গান গাইতে দেখিনি কোনো চরিত্রকে, শিধু এই বিলাস ছাড়া। এমন কিছু হাতিঘোড়া গান নয়, মাঝি-মাল্লার গান যেমন হয় তেমনিই। একবার সে গেয়েছে –

'আমার প্রাণে নাই সুখ – হে

বর উথালি পাথালি আমার বুক।

হয়তো সেই একই দিন, গেয়েছে আর একবার –

তোমার না পেয়ে হিদে বড়ই অ সুখ – হে

বড় উথালি পাথালি আমার বুক।

ইলিশের সম্ভাবনাতে বিলাসের গলায় এসেছে অন্য গান ;

'আমার ভরা জোয়ার গেল,

ভাটার বেলা এল হে

আর আমি রিতে নারি বসে।'

বিলাসের সেই সাগরসঙ্গমে যাবার গান তো আছেই –

'আমার পরান বর উদাস হে

আমি যাব সাগরে।

ঘরে নাই ভাত-পানি

পরনে নাই কানি

পানসা সাঁই নে' আমি যাব সাগরে।'

এরকম গান বিলাস একাধিকবার গেয়েছে –

এই সমুদ্র স্বপ্ন প্রসঙ্গেই এসে পড়তে পারে মাছ বিক্রির পাইকেরি ফড়েনি দামিনী আর তার নাতনি (দামিনীর ভাষার নাতীন) হিমির কথা। প্রথম দর্শনে কিন্তু কোনই ভাবান্তর হয়নি বিলাসের বরং যাবার জন্যই এমন ছটছট করছিল যে পাঁচু ধমকে বলেছে, 'হারামজাদা, পেটে কি তোর দানো রে, অ্যাঁ?'

ঠিক কথা, তবু একটু কিছু যে হয়েছিল তার ইঙ্গিত দিয়েছন লেখক লেখক – 'বিলাস দেখছে। এই বিলাসকে সয়ারাম বলত, বিলাস তোর ভাব বের্‌ভোম্‌ হয়েছে।'

ভাব বিভ্রম যে সত্যিই একটু হয়েছে তা ওর উদাস বসে থাকা, উনুন জ্বালতে ভুলে থাকা দেখে। তাতে অবশ্য ভয়ে বুক উড়ে গিয়েছে পাঁচুর, ভেবেছে – সর্বনাশ! দামিনীর নাতীনের দিকে হারামজাদার দিকে মন টেনেছে নাকি? দুশ্চরিত্র। গাড়ল! অপঘাতে মারে যে মাছমারকে, সেই ডাকিনী চেপেছে শোরের ঘাড়ে।'

এর ওপর যখন আহ্বান করে হিমির বোওঝে বয়ে নিতে যায় বিলাস, পাঁচু ক্রোধার বআধা মানে না, যা মুখে আসে, তাই বলে বিলাসকে। কিন্তু তাতে নিবৃত্ত করা যায় না বিলাসকে, পাঁচু বোঝে বিপর্যয় একটা হতে চলেছে, হয়তো কেউ সেটা আটকাতে

পারবে না। বিলাস এখন হিমির সঙ্গে কথা বলতে কোনো সঙ্কোচনে করে না,আর হিমি ঠাট্টা করে ওকে বলে ঢক।

হিমির সঙ্গে বিলাসের মানসিক ঘনিষ্ঠতা প্রকৃতির নিয়মেই হয়েছে। শারীরিক ঘনিষ্ঠতা এই সঙ্গেই আসে। নিজেদের মন-জানাজানিও হয়েছে প্রায় সম্পূর্ণ করেই। একদিন অমর্তর বউ যে ছড়িয়ে ছিল ওর শরীরে, সে কথা খুলে বলেছে হিমিকে। হিমির শরীরও খুব পবিত্র নয়, সে কথাও বলতে হিমির কোনো সংকোচ নেই। কিন্তু দুটি মন এবং দুটি শরীরের তীব্র মিলনের পরও বিচ্যুত হতে পারে না বিলাস তার সুদূরের আহ্বান থেকে।

হিমিকে প্রথম দেখে যখন সমুদ্রের কথা বলতে শুরু করেছিল বিলাস, পাঁচু ভুল ভেবেছিল, বলেছিল, 'বুসইছি শোরের লাতি, মেয়েমানুষের জন্য তুই বিবাগী হতে চাইছিস।'উত্তরে বিলাস বলেছিল, না। ভগবতীর মেয়ে এলেও সউদ্রে যাব খুড়ো। গঙ্গায় আমার মন মানছে না আর।' এরপর হিমি যখন তার ঘনিষ্ঠতম সান্নিধ্যে, তখনও সে বলেছে, সে সমুদ্রে যাবে। হিমি বলেছে সমুদ্রে যাবার সাহস তার নেই, বিলাসের অকূলে সে বড় পাবে না, বিলাস বলেছ, 'আমি মাছমারা মহারানী, অকূলে আমার জীবন, অকূলে আমার মরণ।'

যে প্রেম বিলাসকে বদ্ধ করে, বিষে দগ্ধ করে, সে প্রেম বিলাসের জন্য নয়। হিমির প্রেমে সে শান্তি পেয়েছে সমুদ্রের স্বাদ, কাংখিত মুক্তি, তাই বলেছে, 'এই তেঁতলে বিলাসকে তুমি যা দিয়েছে, তা আর কেউ কাড়এ পারবে না। সে যে মহারানীর দান গো, মহারানীর দান। আমার পাণ জুড়িয়েছ তুমি, জুড়িয়াছ বলেই আমি সমুদ্রে যাব।'

মাছয়ারাদের ঘনিষ্ঠ জীবন শুধু সমরেশ বসু চিত্রিত করেন নি, সেই সঙ্গে অদৃষ্টকে ছাপিয়ে উঠে বিলশাল অকূলের আহ্বান আত্মস্থ করার স্বপ্ন দেখিয়েছেন – মানুষ ও প্রাকৃতিক শক্তির এই ভীষণ মধুর লড়াই উপজীব্য বলেই 'গঙ্গা' স্বতন্ত্র উপন্যাস এবং বিলাস চরিত্রে তা সার্থকভাবে রূপায়িত।

বিলাস যদি গঙ্গা উপন্যাসের মূল শক্তি, তবে তার উপযুক্ত পরিপূরণ হিমি। শরীরসর্বস্ব স্বৈরিণী মেয়ের চরিত্র সমরেশ বসু অনেক এঁকেছেন। তাই এই উপন্যাসেও দেহবিলাসিনী একটি চটুল নায়িকা আমরা পাব, এইরকমই প্রত্যাশা ছিল। প্রত্যাশার কারণও একেবারে ছিল না এমন নয়। উপন্যাসে প্রথম যে নারীচরিত্র দেখিয়েছেন লেখক, তাকে একটি মেয়েছেলে বলাই ভালো। অসুস্থ স্বামীর কাছে অমৃতর বউ দেহের সুখ পায়নি, সেই দেহের সুখের খোঁজেই ছোঁক ছোঁক করতো বিলাসের চারদিকে। এক দিনের প্রবল ঝঞ্ঝাতেই বুঝেছে, এ ঝড় রয়ে সয়ে উপরি আদায়ের সুযোগ দেয় না, একবার তার মুখে পড়লে উড়িয়ে নিয়ে যায়। এমনকি অমর্তর বউও এই বিধ্বংসী ঝড়ের সামনে দ্বিতীয় বার আসেনি, উপন্যাসে তার আভাস আছে।

দবিতীয়বার যখন মেয়েছেলের প্রসঙ্গ এসেহে তখন 'মেয়েছেলে' হিসাবেই এসেছে। মাছমারাদের যখন অভাব অনটনের তীব্রতা বাড়ে, ঘর খাদ্যের চাহিদা অথচ তা জোগানের ব্যবস্থা নেই, তখন সস্তা মদ আর মেয়েছেলের কাছে গিয়ে জ্বালা মিটিয়ে আসতে হয় নিবারণের মতো মানুষকেও। বোধবুদ্ধি ফিরে এলে অবশ্য বলে 'এই মনটায় পাপ আসে গো, সব সময় বশে থাকে না।'

মাছ বিক্রির ফড়েনীদের প্রসঙ্গ আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বুঝতে পারি, কেউওই সতীসাধ্বী নয়। অন্তত সূত্রসংক্ষিপ্ত এই বাক্যটিতে সেই কথাই প্রমাণ করে – 'আতর সধবা নয়, বিধবা নয়, শুধু ফড়েনী।' বিশেষ অঞ্চলের মাছমারার পাইকার হিসাবে বিশেষ ফড়েনী বাঁধা থাকলেও সেটা অবশ্য আনুগত্যের প্রশ্ন, কিন্তু তাদের আচরণ এবং প্রাসঙ্গিক জীবনযাত্রা শুনলে বোঝা যায়, সে জীবন খুব স্বচ্ছ সরল নয়। যেমন দামিনীর পড়ন্ত যৌবন সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'দেহের স্রোতে নাবালেরই ঢল। ... কিন্তু সেই তো শেষ টান। ঐ টানে পড়লে, পুরুষের উঠে আসা বড় দুষ্কর।' নিজের মেয়ে এবং নাতনী সম্বন্ধে দামিনী পরিচয় দিয়েছে এই ভাবে – 'ওর মা, আমার মেয়ে, বুইলে, কাঁচা বয়সে সম্বন্ধে দামিনী পরিচয় দিয়েছে এই ভাবে – 'ওর মা, আমার মেয়ে, বুইলে, কাঁচা বয়সে বেধবা হয়ে রাঁড় হয়েছিল। সে অবশ্যি বেঁচে থাকলে, এ বছর থেকে বাজারে যেত মাছ

বেচতে। নাতীনেরও আমার সুরাহা হতো একটা। তা ভগবান দিলে না। পেছনে ঘুরছে এখন ছুঁড়ির দশগণ্ডা পুরুষ। ঘুরুক, মেয়ে চট করে টোল খাবে না।'

প্রথম যখন দেখি, তখন হিমির আকৃতি-প্রকৃতির বর্ণনা এইরকমঃ 'গাঁয়ের রংটি কটা কটা। খোলা চুল বাঁধা আছে আলগা করে। চোখ মুখ একরকম। ... বয়স কত আর। দেখে মনে হচ্ছে, ছেলেপুলে হয়নি আজো। গড়ন পিটনে একটু ছেউটি ছেউটি। অর্থাৎ শরীরখানি অকুল হয়নি, কূলের মুখে এসে থুমকে আছে। বর্ষা এলে ভাসাবে পাথারে।'

হিমির প্রথম প্রতিক্রিয়া লক্ষ করবার মতো – 'তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিতে গিয়ে আবার তাকাল। নাকের নাকছাবিটি বোধহয়কেপেও উঠল বারদুয়েক। ... হিমির ভ্রুদুটি তার গম্ভীর মুখে বিদ্যুতের মতো চিক্ চিক্ করে উঠল একবার। ... মেয়ের চোখের কোণে ধিকি ধিকি আগুন দেখা গেছে।'

প্রত্যেকটি কথা লক্ষ করবার মতো। পুরুষের দিকে চোখ পড়ার তাতক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, চোখ ফিরিয়ে নেওয়া, এতেই মনে হয় পুরুষ জাতটা সম্বন্ধে এই বয়সেই হিমি প্রচুর জেনে গিয়েছে, এদের সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল তার অবশিষ্ট নেই। কিন্তু আবার তাকানোর অর্থ একটা অন্য কিছু সে দেখতে পেয়েছে বিলাসের মধ্যে। তার বিদ্যুতের মতো ঝলসে ওঠা ভ্রুকুটি এবং চোখের কোণে আগুন সেটাই প্রমাণ করে। কী দেখে তার এই স্বাতন্ত্র্য ব্যাপারটি মাথায় এসেছে? প্রাথমিকভাবে চেহারা তো নিশ্চয়ই, বিলাস বসেছে গিয়ে কাড়ারে, মনে হচ্ছে, 'গাব-আঠা মাখানো কালো কাঁড়ারের উপরে যেন রঙকরা দারুমূর্তি। কী কালো! যেন কেউটে বসে আছে ফণা তুলে।'

তবু চেহারাই তো সর্বস্ব নয়, অন্য কী দেখে হিমির এই অন্যমনস্কতা, সেটারো খবর নিতে হবে। কারণ হিমির যে পরিচয় দামিনি দিয়েছে তাতে বোঝা যায় ঠিক গড়োপড়তা মেয়ে হিমি নয়। দামিনী বলেছে, 'বে সে করেনি। কত গন্ডা হাত বাড়িয়ে আছে। বলে, রাঁড়ের মেয়ের আবার বে। বেশ আছি খাচ্ছি দাচ্ছি, কোনো ঝক্কিঝামেলা নেই। ...গত এক বছর তো কাটিয়ে এল চুচড়োয়। ...সে মিন্‌সেকে কয়েকবার দেকিচি। বয়স বেশি নয়। শুনিচি মিনসের বাড়িঘরও আছে। ... কিন্তু কই, থাকতে

পারল না, চলে এল। ... দেখলুম নাতনীর বুক ফাটছে মুখ ফোটে না। ... নাতনীর আমার এই সোমসারের পরে বর বিরাগ।' আরো বলেছে দামিনী, অন্য দিন অবশ্য। বলেছে, আমার লাতঈনের কপালের কথা বলছে। লাখ ট্যাকার মালিক, হাত পেতে চেয়েছিল আমার লাতিনকে। গঞ্জে তার বড় কারবার। মোটোর বাস, লরির ব্যবসা। তা মেয়ে জবাব দিয়েছে, ট্যাকায় বিকোতে পারব না।'

কীসে বিকিয়েছে বুড়ির 'লাতীন'? বোঝা মুশকিল, তার চোখের বিদ্যুৎ দেখে পাঁচুও ভেবেছে ভাইপো আমার মাছমারার ছেলে। ওতো লাখপতি নয়।' কিন্তু নিজে থেকেই হিমি কৌতুকে বলেছে, 'খুড়ো, তোমার ভাইপো যেন এক ঢপ বাপু।' নিজে থেকেই সাহায্য নিয়েছে তার পেছল পাড়ে পা রাখতে গিয়ে। হিমি বিলাসের টানে কাছে আসে, বিলাস সামনে কথা বলে তার সঙ্গে, দেখে ভয়ে শিউরে ওঠে পাঁচু বুক। একদিন না থাকতে পেরে বলেই ফেলে সে কথা, কিন্তু বোঝা অসাধ্য, কী দিয়ে বশ করেছে বিলাস ওকে।

এর মধ্যে চুঁচুড়ার লোকটি নাকি আবার আসে। তাকে স্রেফ জবাব দিয়ে দেয় হিমি। বলে 'যেতে টেতে পারব না। ও সবে আর নেই। এসেছ, বস, দুইদন্দ গল্পগুজব করে যাও। রাজি আছি।'

তা আছে, তবে অনেক কথা হয় বলেই বোধ হয় বিলাসের কাছেও সে আর আসতে পারে না। কিন্তু শোনা যায়, বিলাস নাকি ক্ষেপে গেছে। তার কথা জিজ্ঞেস করে একে ওকে, মহাজনী নৌকায় উঠে মাঝি ঠ্যাঙ্গায়। তাই পাড়ায় ছল করে, জল নিতে এলে হিমি পারে না তার সঙ্গে দেখা না করে। এবার আর থাকতে পারে না আত্মসমর্পণ না করে। বলে, 'আমি অজাতের মেয়ে, বর দুখু পেয়েছি এই মানুষের সোমসারে। ভেবেছিলুম আর নয়। সোমসারে নেই মনের মানুষ। থাকব একলাটি ...আমার একলা থাকার সাহস হারিয়ে গেছে।'

আসলে কী যে হয়েছে, সে কথা লেখক বলেছেন পরে একটু স্পষ্ট করে। 'জন্মের নেই ঠিক ঠিকানা হিমির। প্রথম থেকে জীবনে দেখেছে বেপরোয়া উতশৃংখলতা। নিজেকে পারেনি বাঁচিয়ে ফিরতে। অনেক টানাপোড়েন গেছে। জীবনে কোনো বাধানিষেধই

দাঁড়ায়নি মাথা তুলে। প্রেম করতে চেয়েছে, চেয়ে ঘৃণা করেছে বেশী।' এবার জীবনে প্রথম প্রেম এসেছে হিমির। দুর্লভ যোগাযোগ, মানুশের জীবনে জেতা প্রায়ই ঘটে ওঠে না সত্যি কথাটা বলেছে দামিনী, দীর্ঘশ্বাসেরসঙ্গে। সোমসারে মনের মানুষ সবাই খুঁজে মরে। তাকে কি পাওয়া যায়? যায় না। হিমির জীবনে এ দুর্লভ সৌভাগ্য ঘটেছে। কিন্তু ঘটোলেও সম্পূর্ণ করে দুটো মানুষ দুটো মানুষোকে পায় কি? দুটো মানুশ একেবারে নিশেষে একজন অপর একজনের মতো হতে পারে কি? পারে নাবোধহয়। নইলে ঢপের কাছে এসে হিমি যে অকূলে ভেসে যাবার কথা বলেছে, একটু মনে করে দেখাঁ যেতে পারে সেই সংলাপের অংশঃ

'নোঙর না করলে কী হয় ঢপ?

বিলাস হিমির দিকে চোখ তুলে বলল, ভেসে যাবে।

- অকূল পাথারে নাকি?
- বিলাস বল, হ্যাঁ বড় অকূল। ডাঙার মানুষের প্রাণ কাঁদবে সেই অকূলে।
- -কেন?
- -ভয়ে।
- -কিসের ভয়?
- -প্রণের।
- -প্রাণের ভয় না থাকলে?
- -মন গুইণে ভয়। মনের ভয় ভয় আছে না?
- -তবু অকূলে যে বড় মন টানে ঢপ?

  এই হিমিই কিন্তু অকূল জলের আহ্বানে ভেসে যেতে পারেনি, পাশে বিলাস থাকলেও নয়। সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া সাঁইদারকে বলে, 'আমি এতটুকু পাণী, তোমার অকূলে আমি বেড় পাব না। এই আমার বড় মন-চনমনানি ছিল। তুমি যাবে অকূল সমুদ্রে, আঁধার রাতে আমার পাণ পুড়বে, তোমার নাগাল তো আমি পাব না।'

তবু মনের মানুষকে বুঝি এমনি করেই পাওয়া যায়, সব দিকে তার সমান না হয়েও। পুরুষ বলে, তুমি যা দিয়েছ কু তা কাড়তে পারবেনা। নারী বলে, তোমার জাওয়া-আসার পথে পথ চেয়ে বসে থাকব। এমনি করেই জীবনে জীবন যোগ হয়। এমনি করেই অমর্তর বউএর বিষক্রিয়া কেটে যায় বিলাসের। এমনি করেই প্রেমের অমৃত সার্থক করে মানুষের জীবনে।

নায়ক নায়িকা তো বটেই, কিন্তু ঔপন্যাসিকের জাত চেনা যায় অপ্রধান চরিত্র চিত্রণেও লেখকের সতর্কতা সচেতনতা ও সামর্থ্য থেকে। গঙ্গা উপন্যাসে বিলাসের কাকা পাঁচু বা বন্ধু সয়ারাম অথবা হিমির দিদিমা দামিনী খুব অপ্রধান চরিত্র নয় – কিন্তু অক্ষম ঔঈপন্যাসিক এমন চরিত্রের প্রতিও সুবিচার করতে পারেন না।

চরিত্র এবং নামকরণে সমরেশ বসু যে প্রথম থেকেই সতর্ক তার প্রমাণ পাওয়া যায় চরিত্রের নাম থেকেই। গ্রামে গঞ্জে এক ধরনের নাম রাখাটা প্রায় রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেছে, তাই লেখকের বর্ণনায় দেখি, ‘এক পাড়াতেই সাতটা মেয়রের নাম পাঁচী। একতাকে ডাকলে সাতটা সাড়া দেয়। ঐ তেঁতলে বিলেসের মতো। পাড়ায় বিলেস আছে তিনটি। তেঁতউলতলার বিলেস, তেঁতলে। তেমনি গাম্বিলতলার পাঁচী, গাম্‌লী পাঁচী।

পাঁচু চরিত্রে জটিলতা কিছু নেই। মালোর ছেলে মালো, মাছমারা শিখেছে, আকাশের চেহারা শিখেছে, বংশবৃদ্ধি করতে শিখেছে, দুবার সমুদ্রেও ঘুরে এসেছে। দায়িত্বও মতো দাদা...ছিল পিঠোপিঠি। কিন্তু হাতে ধরে সব শিখিয়েছে পাঁচুকে। সঙ্গে করে নিয়ে গেছে সবখানে। রাগ হ্লে দুঘা দিয়েছে। সোহাগ হলে চুলের মুঠি ধরে নিজের হাতে ভাত খাইয়ে দিয়েছে। একে সাঁইদার, ওপর গুণিন মানুষ, এমন মানুষ সঙ্গে থাকলে চিন্তা! কিন্তু অদৃষতের লিখন তো আর খন্ডানো যায় না, এমন মানুষও সমুদ্রযাত্রা করতে গিয়ে অকালে প্রাণটা দিল।

সে সমুদ্রযাত্রার কথা মনে হলেই প্রাণটা কেমন করে ওঠে পাঁচুর। দুজনের স্ত্রীই গর্ভবতী ছিল সেবার। দাদকে জলের বুকে বিসর্জন দিয়ে চলে এলো

পাঁচু। দাদার ছেলে বিলাসের ভার পড়ল ওর ওপর। সবই হাতে করে শিখিয়েছে পাঁচু ওকে, কিন্তু ভয় পায় ওর উদ্ধত আচরণ দেখে, চখে মুখে অসহ্য তেজ দেখে আর মাঝে মাঝেই সমুদ্রযাত্রার স্নগকল্প দেখে। গুণিনের বিচারে সমুদ্রযাত্রা তার বারণ, একথা বলেও কোনো লাভ হয়নি তাকে। চিরাচরিত যেসব নিয়ম মেনে এসেছে সবাই, পাঁচু সেসব মেনে চলতেই অভ্যস্ত। পাঁচজনের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখতে হবে, কেউ একটা অন্যায় কথা বললেও প্রতিবাদ না করে চুপ করে থাকতে হবের, মহাজনে হাজার গালমন্দ করলেও মুখ বুজে সহ্য করতে হবে, এসব নিয়ম সে নিজে প্রাণপণে মেনে চলে এবং ভাইপোকে মানতে শেখায়। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি। বিলাস অস্থানে এমন মাথা গরম করে ফেলে যে গালাগাল দিয়ে গাঁয়ে কাঁদা ছুঁড়ে তাকে থামাবার চেষ্টা করে সে। গালাগাল দেবার সময় মুখ ফসকে কখনো তার হারামজাদা বার হয় না। সর্বদাই সে বলে শোরের লাতি কারণ হারামজাদা বললে গাল পাড়া হয়, নিবারণকে সেটা প্রাণ থাকতে সে করতে পারবে না।

বিলাসকে সামলানো এমনিতেই পাঁচুর পক্ষে মুশকিল, কিন্তু সেটা সীমাহীন হয়ে পড়ে যখন সে আবিষ্কার করে দামিনির নাতনী হিমির প্রতি বিলাসের আকর্ষণ। তবে প্রচুর গালমন্দ করেও সে ঘোরাতে পারেনি বিলাসকে। অবশেষে নিদানকালে পাঁচু বলে গিয়েরছে বিলাসকে – 'দামিনীর লাতীনের পাণখানি পোষ্কার বলে বুইছি। ছুড়ি তোকে ভাক্লোবাসে। মানুষের জীবনে এমন হয়। দামিনী চেয়েছিল তোর বাবাকে, পায় নি। লাতীনের পেয়েছে তোকে। মাছমারার ঘরে যদি মেয়েটা আসতে চায়, তবে নিস।'

গোটা উপন্যাসের কথক, ধরতে গেলে, পাঁচু। সেই হিসাবে চরিত্রটি গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। কিন্তু সরল চরিত্রকে অনর্থক কিছু গভীর কথা দিয়ে জটিল করেননি লেখক। জটিল কথা আছে বরং দামিনীর মুখে। জটিল কথাই আছে, তাকে বুঝবার বা বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা নেই। থাকলেও তা মানতেও না। মাছক্রেতা পাইকারি ফড়েনী। অনেক পুরুষেরা সঙ্গে সমজোতা করতে হয়,

অনেক ছলাকলা করতে হয় – তাদের এই ব্যবসায় স্বৈরিণীর সংখ্যাও কম নয়। নিজের মেয়ে বিধবা হওয়ার পর বেশ্যা হয়ে গিয়েছিল, সে কথা বলতে তার তেমন কোনো বিশেষ অনুভূতি হয় না, কিন্তু নাতনী যে বিয়ে থা করলে না, সে কথা বলতে যেন বেশি কষত। নাতনী হিমিকে সে পুরো বুঝে উঠতে পারে না, কিন্তু এই সূত্রেই জটিল রহস্যময় কথা তার মুখে আমরা শুনতে পাই। সে বলে, 'সোমসারে মনের মানুষ সবাই খুঁজে মরে। তাকে কি পাওয়া যায়? যায় না। কখন বয়সে ঘুচে যায়, মরণ আসে, তার কোলে গিয়ে জুড়োতে হয়। তা বলে সোমসারের পরে রাগ করে তো লাভ নেই।'

মনের মানুষ দামিনী নিজেও যে পায়নি, সে কথাটিও বেরিয়ে আসে তার মুখ দিয়ে। আমরা শুনি – 'মনে বড় সাধ ছিল আমি সাগরের ফড়েনী হব। এখানে আমার মন মানে না। কিন্তু কই, যাওয়া হল না তো, মনের সাধ কি কোনদিন মেটে? মেটে না।'

দামিনীর শুকনো অশক্ত শরীরেও এত ব্যথা লুকোনো ছিল, ভাবতে অবাক লাগে। আরো কিছু রহস্যময় কথা বলেছে দামিনী। জীবন সম্বন্ধে বড় কথা সে বলতে পারে না, বলার কথাও নয়। কিন্তু জীবনকে যেটুকু বুঝতে পেরেছে সে, সেটা বড় আতরিকতার সঙ্গে বলতে পেরেছে পাঁচুকে – কপাল কাকে বলে, তা জানি নে। এতখানি জীবন কাটল আমার। কত কী এল, কত কী গেল, কিছুই তো ধরে রাখতে পারিনি দাদা। কপাল কাকে বলে, বুঝলুম না। খালি বুঝলুম, জীবনটা ফুটো কলসী, সে কখনো ভরে না।'

আর একতী অসাধারণ চরিত্রের কথা না বললে চরিত্র বিষয়ক এই প্রসঙ্গে শেশ হতেই পারে না, সে চরিত্র হল সয়ারাম অর্থাৎ কিনা সখারাম। বিলাসের ছায়ার মতো বন্ধু, গাঁয়ে গা লাগিয়েই থাকে সবসময়। সত্যিকারের ভালোই সে চায় – একেবারে নির্ভেজাল বন্ধু। কিন্তু স্বভাবে বিলাসের একেবারে উল্টো। বিলাসের ষণ্ডা এবং গোঁয়ার তো সে নয়ই, উপরোন্তু বিলাস ছাড়া ছেলে বন্ধুও তার কম- 'পুরুষ মানুষের খবর কম জানতে পারে সয়ারাম, মেয়েদের খবর তার নখদর্পণে। কেন না, ভালো বল, মন্দ বল, মেয়েমানুষের মতন, মেয়েদের

সঙ্গে তার ওঠাবসা বেশী। গাঁয়ের বউ ঝিয়েরা মন খুলে তার সঙ্গে ঘরের মতন, মেয়েদের সঙ্গে তার ওঠাবসা বেশী। গাঁয়ের বউ ঝিয়েরা মন খুলে তার সঙ্গে ঘরের কথা বলে শান্তি পায়।'

বোঝাই যায় মেয়েলি সবভাবের ছেলে, কিন্তু বিলাসকে বড় ভালোবাসে। বিলাসও যে ভালোবাসে না তা নয়, মনের কথা খুলে বলেও মাঝে মাঝে, কিন্তু এমন অল্পবুদ্ধি সয়ারাম এবং না ভেবেচিন্তে আবোল তাবোল কথা বলে বসে, বিলাসের মেজাজ গরম হয়ে ওঠে – হাত চালিয়ে দেয় সে। অথচ অমর্তর বউয়ের সঙ্গে পাপাচরণ করার পর বিলাস একমাত্র সয়ারামকেই খুলে বলতে পেরেছিল সব কথা। বেশ জ্ঞানবৃদ্ধের মতো জ্ঞান দিয়েছিল তখন সয়ারাম বন্ধুকে, বলেছিল – ভগবানের ওটা একটা মস্তবড় খেলা। কত স্বাদ সৃষ্টি করে রেখেছেন সংসারে। ... মায়ার আর এক আস্ম স্বাদ ! তুমি বাঁধা আছ ৈ মায়ার বাঁধনে। পরে ভালো করে করে বোঝাতে চেয়েছে বন্ধুকে, মুনি পুরুষের মতি বেরভোম্ হয়, তোর কী দোষ। তুই তো জোরজবরদস্তি করে কিছু করিসনি। সে করেছে। তবে হ্যাঁ, পেতনীর দশদিন, ওঝার একদিন।'

ওই একইভাবে সয়ারাম খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হিমির সঙ্গে বিলাসের সম্পর্কও জানবার চেশটা করেছিল নান্রকম করে। সরল মানুশ, যখন বুঝতে পেরেছিল, হিমির ওপরই ওর মন পড়ে রয়েছে, তখন বলে ফেলেছিল, 'শুনি, মা ইয়োবেবুশ্যে।' এ কথা বলার ফলও সে পেয়েছিল। কিন্তু বিলাসের সঙ্গ সে কখনো ছাড়েও নি – পাঁচু থাকতে নয়, পাঁচু মারা যেতে তো আরো নয়। হিমির কাছে গিয়ে পেট ভরে যেদিন বিলাস খেয়ে এসেছে, সেদিনও সয়ারামই ছিল তার পাশে, ছায়ার মতো। চরিত্রচিত্রণের অসামান্য দক্ষতার পরিচয় এই চরিত্রনির্মাণে আছে, কোনো সন্ধেহ নেই।

অনেক প্রস্তুতি নিয়ে গঙ্গা উপন্যাসে লেখা হয়েছিল, অভিজ্ঞ মানুশের অনেক অভিজ্ঞতার পাথ নিয়ে, তবেই। স্বাভাবিক ভাবেই মাছমারাদের নিজস্ব কথোপকথনের অনেক শব্দও এই উপন্যাসের অঙ্গীভূত হয়েছে। সেই কথাগুলি সমরেষ বসু বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন উপন্যাসের মধ্যে। তবু কিছু বিশিষ্ট পরিভাষা আগে ভাগে জেনে রাখলে

উপন্যাস পাঠের সুবিধা হতে পারে মনে করে প্রধান শব্দগুলির একটা পরিচায়িকা দেওয়া হল।

কুতঘাতঃ এখানে কুত হয়, অর্থাৎ নৌকার মাপ হয়। আকারে তা কত বড়, গভীরতা কত, মাঝি মাল্লা কত ইত্যাদির মাপ জোক হয় এবং সেইমতো তার খাজনা ঠিক হয়।

টোটাঃ নানারকমের দৈব দুর্বিপাক, যেমন মন্বন্তর, মড়ক, মহামারী ইত্যাদি।

সাইদারঃ সমুদ্রগামী নৌকার যে সর্দার, তাকে বলা হয় সাঁইদার। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, সমস্ত উপন্যাস জুড়ে এই ধরনের সর্দারকে সাইওদার বলা হলেও একেবারে শেষের দিকে সাঁইদার কথটা ব্যবহার করা হয়েছে। সম্ভবত লেখকের অনবধানেই ব্যাপারতা ঘতেছে। আমার অনুমান প্রকৃত শব্দটি সাইদারই হবে।

দক্ষিণোরায়ঃ সুন্দরবনের ব্যাঘ্রদেবতাকে এই নামেই ডাকা হয়। তাঁর স্তুতি করে রায়মঙ্গল কাব্যও রচিত হয়েছে।

শাবরঃ নৌকার ঝাঁক, অবশ্যই মাছমারাদের নৌকা। নৌকার হাত বলা হয়েছে উপন্যাসে।

তিবড়িঃ মাছমারাদের নৌকাতে জ্বালাবার জন্য তোলা উনুন।

গোনে ও বেগোনেঃ জোয়ারে ও ভাটায়।

বাছারঃ মাছমারা সম্প্রদায়ের সম্মানসূচক খেতাব। বিশাল ওজনের তালগাছের গুঁড়ি টেনে যে সবচেয়ে বেশি দূর নিয়ে যেতে পারে তাকেই বাছার সম্মানে ভূষিত করা হয়।

সাজারঃ মাছমারাদের সার্বজনীন গঙ্গাপূজা।

সাজভাটাঃ একটি ভাটার সময় পাওয়া সমস্ত মাছ সাজারের চাঁদা হিসাবে দিয়ে দেওয়াকে বলে সাজভাটা।

দখনে বাওড়ঃ সমুদ্রের ঝড়।

স্যাংলোঃ ইলিশ মাছ ধরবার হাত জাল। জালের দুই লম্বা মুখ সলি পরানো – ওপর সলিতে বাঁধা কাছি নীচের সলিতে সলিত সিশল বা পাথর।

পাথালি চলাঃ নৌকা নদীর আড়াআড়ি চলা।

ক্যাঁচাঃ কয়েকটি ছুঁচলো ফলাওয়ালা লোহার ডণ্ডা, জলে মাছকে বিদ্ধ করার জন্য।

মেকোঃ বাচ্চা কাঁকড়া।

জোয়ান কোটাল ও মরা কোটালঃ নদীর জল বেরে ফুলে ফেপে ওঠাকে বলে জোয়ান কোটাল। বর্ষার জলেও তা হতে পারে, আবার পূর্ণীমা অমাবস্যায় চাঁদের টানেও হতে পারে। দুটি জোয়াঙ কোটালের মাঝে আসে মরা কোটল, অর্থাৎ তান কমে যাওয়া।

ভারী গোনঃ সমুদ্রের প্লাবন বান।

আগ্নাঃ জোয়ারের আগমন।

চকঃ মাছের ঝাঁক।

জলেঙ্গা জলঃ গঙ্গার জল যখন লালচে হয়ে যায়, তাকে বলে জলেঙ্গা জল।

বিনজালঃ বাঁশের জাল, নীচে মাটির সঙ্গে জাল গাঁথা থাকে ‘কাঁকড়া’ দিয়ে। কাঠের বিরাট বড় লাঙলের মতো খোচাকে বলে কাঁকড়া।

বেলিয়ে যাওয়াঃ গহন জলের জাল বালিচাপা পড়ে হারিয়ে যাওয়াকে বলে বেলিয়ে জাওয়া। প্রসঙ্গত, এমন কথা হয়তো আমাদের মনে হতেই পারে যে নতুন শেখা অনেক পরিভাষা আবেগের প্রাবল্যে উপন্যাসে স্থান পেলেও সবর্ত্রই হয়তো তা অপরিহার্য ছিল না।

বিষয় এবং জীবনদৃষ্টি উন্নত হলেই মহৎ উপন্যাসের সৃষ্টি হয় না, রচনাশৈলীও মানের হওয়া প্রয়োজন। এ কথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে সমরেশ বসুর বলিষ্ঠ ভাষাভঙ্গি তাঁর এই প্রয়োজন। এ কথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে সমরেশ বসুর বলিষ্ঠ ভাষাভঙ্গি তাঁর এই উপন্যাস রচনায় সম্পূর্ণ সহযোগী হয়ে উঠতে পেরেছে। ভাষা

বিষয়ে সামান্য কিছু বিশ্লেষণের আগে সমগ্র উপন্যাসের বিন্যাসকৌশল বা বৃত্তনির্মাণের দক্ষতার কথা বলতে হবে।

ছোটগল্পে যে আরম্ভকে বলে চকিত আরম্ভ, উপন্যাসটি শুরু হয়েছে সেই ভাবেই। একটি বিচিত্র জনপদের বিচিত্রতর সম্প্রদায়কে নিয়ে রচিত উপন্যাস – স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর পরেইচয় দিয়ে উপন্যাস শুরু করতে হবে, এই ধরনের একটড়ি ধরনের একটি সঙ্কোচ ঔপন্যাসিকের মনে খুবই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। জলের বেগমান গতির সঙ্গে তাল ররেখেই যেন লেখক বেছে নিলেন একটি বেগবান আরম্ভ – আগাম দলের তিনটী নৌকা ভাটার টানে তরতর করে নেমে এল, পুবের কেষ্টপুরের খাল গেট পেরিয়ে নোনা বিলের পাশ কাটিয়ে।

লক্ষ করবার মতো, এই গতি উপন্যাসের প্রায় সবর্ত্র বজায় রেখে গিয়েছেন লেখক। কোত্থাও তাকে শ্লথ হতে দেননি। উপন্যাস শুরু হয়েছে মাছমারাদের দলের অভিযানের মধ্য দিয়ে, যে দলের অন্তর্ভুক্ত পাঁচু এবং এ কাহিনির নায়ক বিলাস। অথচ আগেকার পাঁচুকে যে দুবার যে সমুদ্রে নিয়ে গিয়েছিল, মাছমারায় এবং অন্যান্য আচার আচরণে যে ছিল চির দুর্দম, দুর্বিনীত যাকে জীবনসঙ্গী করতে চেয়েছিল। সমুদ্রযাত্রা করতে গিয়েই নিবারণ অকালে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল। বিলাস যেন আচার আচরণে, স্বভাবে প্রকৃতিতে ধরন-ধারণে নিবারণেরই একটি প্রতিমূর্তি, সুতরাং বিলাসের গল্পটা ঠিকঠাক বলার জন্যেই নিবারণের গল্পটা বলার দরকার ছিল।

তবু সমরেশ বসু গল্প শুরু করেছেন বিলাস থেকে, অথচ অদ্ভুত বিস্ময়ে আমরা দেখতে পাই, নিবারণের গল্পটাও বলা হয়ে গিয়েছে। ঘটা করে অতীত কথন পদ্ধতির প্রয়োগ তিনি করেননি, কোথাও মনে হয়নি জোর করে গল্পটা বলার চেষ্টা করছেন, যেন বহতা জলের টানের মতোই গল্পের টানে টানে পুরনো গল্পটা বর্তমানে কাহিনির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। একটানা এই স্রোত সৃষ্টি করবেন বলেই বোধহয় উপন্যাসে ওনো ওনো অধ্যায় বিভাগ লেখক করেননি – টানা গল্প চলেছে তর তর করে। তাঁর মধ্যে কিশোর বিলাস প্রেমের উপলব্ধি শেখে, কাকাকে হারানোর যন্ত্রণা সহ্য করতে শেখে, মহারাণীর প্রেমকে স্বীকার করেও বিছেদের অনল পেরিয়ে চলে যেতে শেখে সমুদ্রের সন্ধানে।কী

আশ্চর্যভাবে সাহায্য করে এই কাজে সমরেশ বসুর ভাষা। আদ্যন্ত এই বৃত্তমির্মাণের মতোই – স্রোতের টানে এগিয়ে যাবার ভাষা, গঙ্গার জল্রের মতো চলন্তা ভাষা। আরম্ভের যে বাক্যটি উদ্ধৃত করেছি, সে অনুচ্ছেদতি শেষ করলেই বোঝা যাবে ভাষার কী গতি। পুনরাবৃত্তিই করি – 'আগাম দলের তিনটি নৌকা ভাটার তানে তর তর করে নেমে এল, পুবের কেষ্টপুরের খাল-গেট পেরিয়ে, নোনা বিলের পাশ কাটিয়ে। তিনতি বাছরি নৌকা। এল পুব থেকে। খাড়া পুব নয়। পুব দক্ষিণ থেকে। দুতি এল পুরোখোরগাছি থেকে । আর একতি ধলতিতা গাঁয়ের।'

এবং এই ভাষারই স্ররবত্র। প্রায় আধাআধি এগিয়ে গেছে উপন্যাস, সেখানে থেকে একটু ভাষার নমুনা দিই; পাঁচু মুখ ফেরাল জলের দিকে। নৌকা দুলছে। ভাটা নামছে এখনো তর তর করে। শব্দ করে নামছে। আকাশে মেঘ জমছে, উড়ে উড়ে যাচ্ছে সারাদিন ধরে। এখন এমনি করেই যাবে। তারপর ঘোর ঘনঘটা নামবে। আজ সপ্তমী।

এই রকম কাটা কাটা বাক্য। খন্ডিত বাক্য বলেই দুরন্ত গতির, সেই সঙ্গে অব্যররথ ব্যঞ্জনা তাঁর। ব্যঞ্জনাময়তা এই ভাষার দ্বিতীয় এবং বলতেই হবে, সভচেয়ে আকর্ষনীয় বৈশিষ্ট্য। বলতে পারি, এই ব্যঞ্জনা এবং সঙ্কেতেই এ ভাষার বৈভব। আপাতদৃষ্টিতে সহজ সরল মাছমারাদের সাদামাটা গল্প, কিন্তু তাঁর মধ্যেই যে অনেক গভীর কথা লেখক শোনাতে পারেন – এক কথায় ভাষাকে তাঁর নিজের প্রয়োজনে কত নিপুণভাবে কাজে লাগাতে পারেন, গঙ্গা উপন্যাসে তাঁর অজস্র প্রমাণে ছড়িয়ে আছে। দুটি একটি দৃষতান্ত দিলেই কথাটা বোঝা যাবে।

নিবারণের মৃত্যু এই উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কিন্তু যেহেতু মূল ঔপন্যাসিক পর্বে ঘটেনি, টুকরো অতীত কথনের মধ্য দিয়ে কয়েকবারে তা উঠে এসেছে উপন্যাসের মধ্যে। বিশদভাবে এই দৃশ্য ফুতীয়ে তোলা হয়নি, কিন্তু মৃত্যুর এই ভয়াবহতা ভাষার বৈভবে কেমন প্রতিকায়িত হয়েছে, দেখা যেতে পারে – জনে আসন্ন এন্স সর্বনাশকে দ্যোতিত ক্রছে প্রকৃতির এই বর্ণোনাঃ

‘দাদার মৃতদেহ চোখে দেখার পর পাঁচুর গলা ফাটানো চিৎকার, এবং তারপর – বাতাসের শব্দ হয়ে উথোল দ্বিগুণ। গাছে গাছে ঘর্ষোণে ক্রুর দাঁত কড়মড়ানি গেল শোনা। পাঁচু ডাক গাছে গাছে ডালে ডালে গেল পেচিয়ে জড়িয়ে।’

অমৃতর বউয়ের সঙ্গে শারীরিক ঘনিষ্ঠতার কথা উপন্যাসে আছে, আছে হিমির সঙ্গেও – বিলাসের সঙ্গে তবু এই সব বর্ণনায় শরীর উঠে আসেনি কখনো, এসেছে প্রকৃতি এবং তাতেই শরীরের সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অমৃতর বউয়ের কথা বলতে গিয়ে লেখক বলেছিলেন, ‘রাইমঙ্গলের জোয়ার এসেছে – আর হিমির প্রসঙ্গে লিখেছেন, কাছে লেপে এলো হিমি। ছেউটি গাঙ্গের জলে ভাসালে গো। দুহাত দিয়ে বিলাসের কুচকুচে পেশল হাতখানি জড়িয়ে ধরল হিমি। আগনা ছুঁল ডাঙা।’

শুধু আগনা ছুঁল ডাঙা তেঁ যে কথা বলা যায় বিলাসের প্রকান্ড কালো বুকে ছোট একটি তারার মতো হিমি মিটমিট করে জ্বলে উঠলো নিঃশব্দ হাসিতে। এই সংকর অলঙ্কারে যত কথা বলা যায় দুপাতা বর্ণোনাও সে কাজ করতে পারে না।

সাদামাটা উপন্যাস, ওপর থেকে দেখতে অন্তত তাই; যদিও সচেতন পাঠক বুঝবেন, এর মধ্যে জীবনের গভীর তত্ত্বও আছে। অথচ ভাষার এমন আশ্চর্য গুণ যে চরিত্রের সঙ্গে অন্বিত ভাষা, প্রসঙ্গের সঙ্গে অন্বিত প্রসঙ্গ এমনই অনিবার্য যে একেবারও মনে হয় না , লেখক জীবন সম্বন্ধে কোনো তত্ত্ব কথা আমাদের শোনাতে চান। দৃষতান্ত হিসাবে দামিনীর জীবনদর্শনের কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি তাঁর কথা স্মরণ করতে পারি। কিংবা ধরা যাক ঠান্ডারামের মৃত্যুর কথা। তাঁর মৃত্যু যে বিত্তবান মানুষের কাছে কী প্রতিক্রিয়া নিয়ে আসে তা বোঝবার জন্য পালমশায়ের কথা আছে, তিনি বলেছিলেন, এঁরা আসেই বা কেন, মরেই বা কেন। এই প্রসঙ্গ টেনে লেখা হয়েছে –

তা বটে। সংসারে মানুষ আসে কেন, কেন বা মে্র। উজান ঠী সমুদ্র থেকে মাছ কেন আসে, মরে কেন, ভাব একবার। সাধু ফকিরের কথা জানিনে। জীবনের সঙ্গে গাঁটছাড়া বেঁধেছি আমি, আমি তাঁর প্রেমে পড়েছি। তাই না জীবধর্ম আমাকে পালন করতে হয়।

কখনই জল দেখে প্রতিক্রিয়াও এখানে স্মরণীয় – জলের এমনি জাওয়া আসা। জীবনের মতো। সুখ দুখের মতো। অনে কোরো না, পাহাড়ী ঢল এসেছে এর মধ্যেই। এখন যে লাল দেখছ, এ উত্তরের গাঙের জল। এর মধ্যে এখনও প্রাণের উত্তাপ আছে খানিক।

কখনই কি আরোপিত মনে হয়নি এসব কথা? সমস্ত উপন্যাস খুঁজে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত পেয়েছি আমি তাঁর, তাও একটি মাত্র পংক্তিতে। বিলাস তাঁর জীবনের একটি পাপের কথা উল্লেখ করেছে, হিনিও বলেছে তাঁর পাপের অন্ত নেই, তখন বিলাস বলেছে, আমরা দুজনেই ধোয়ামোছা করে নিই জীবনটা। কথায় একটু শহুরে গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। অন্তত মাছমারাদের আঁশটে গন্ধ নেই।

অবশ্য এ কথাটুকু না বললেই ভালো হত। কারণ ভাষার যে ঐশ্বর্য লেখক সৃষ্টি করেছেন, তুলনায় এটুকু কিছুই নয়। নদী ও নারী সমার্থক হয়ে উঠেছে তাঁর এই উপন্যাসে। জলেঙ্গা জলের রঙ হয় লাল এবং তারপরই নদীগর্ভ মাছে ভরে ওঠে – এই মাছমারাদের জীবনচর্যাকে জীবন্ত করে তুলেছেন। এবং তাঁর আশ্চর্য ভাষাই তা সম্ভব হয়েছে, তাঁর কোনো তুলনা নেই। বর্ণা এইরকমঃ তাঁর আগে তোমাকে জানান দিয়েছে অম্বুবাচী। জানান দিয়েছে, টানের দিনের কচি মেয়েটি, মা হবেন এবার। নারীত্বে দর্শন করছেন সসাগরা ধরিত্রী। ...তোমার আমার ঘরণী আর কন্যার মতন। ... মা হলেন এবার সেদিনের মেয়ে। কোল ভরে এবার জন্ম হবে সোনা মানিকের। চেয়ে দেখ তোমার ঘরের কুলায় যিনি ঘরণী, তিনি ক্ষুদ্রবেশে পৃথিবীর লক্ষণ নিয়ে আছেন। ...যুবতী হয়েছে, এবার জীব দাও। ফল হবে। মাঠে ফসল হবে, মাছ আসবে এবার জলে।

যুগপৎ স্মর্থ এবং সুন্দর গদ্যের এতো ভালো নমুনা সাম্প্রতিক সাহিত্যে খুব বেশি আছে বলে আমি জানি না। একটি অসাধারণ মৃত্যুদৃশ্যের কথা উল্লেখ না করে যদি এ প্রসঙ্গ শেষ করি তবে গঙ্গা উপন্যাসের সৌন্দর্যের একটি প্রধান দিকই অনাবিষ্কৃত থেকে যাবে। বিলাসের বাবা নিবারণের মৃত্যু সাক্ষাৎভাবে সমরেশ বসু বর্ণনা করতে পারেননি। কারণ তা ছিল তাঁর উপন্যাসের সময়বৃত্তের বাইরে। সেই জন্যই অবসরের

খন্ডিত কিছু চকিত চিত্রে তা উপস্থিত করতে হয়েছে। কিন্তু সে সমস্যা ছিল নিবারণের ছোটভাই পাঁচুর ক্ষেত্রে – কারণ তা ছিল ঔপন্যাসিক ঘটনাক্রমের মধ্যেই, যেহেতু পাঁচুর মৃত্যু দুটি ছাড়পত্র দিয়েছে বিলাসকে, একঃ হিমিকে জীবনসঙ্গী করার অনুমতি, দুই সমুদ্রস্বপ্নের নির্বাধ মুক্তি।

শুধু যে এই কারণেই পাঁচুর মৃত্যু এই উপন্যাসের সম্পদ তা নয়, যে দক্ষতায় এবং ভাষা প্রযত্নে এই ব্যাপারটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে – একটু জোরের সঙ্গে বলা যায়, বাংলা কথাসাহিত্যে তা শ্রেষ্ঠ মৃত্যু দৃশ্যগুলির সঙ্গে একাসনে বসতে পারে এবং আমাদের সংগ্রহে শ্রেষ্ঠ মণীমুক্তার সংখ্যা খুব বেশি নয়। এই প্রসঙ্গেই যে কথাটি স্মরণ না করলে আলোচকের রসবোধ সম্বন্ধে সংশয় জন্মাতে পারে – সেটি হল অ-বাংলা সাহিত্যে আরো একটি মৃত্যুদৃশ্য, যেটি আমরা আর্নেস্ট হেমিঙওয়ের ‘ওল্ড ম্যান এন্ড দি সি’ উপন্যাসে। ইতিপূর্বে নদীভিত্তিক কিছু উপন্যাসের কথা আমরা স্মরণ করেছি ‘গঙ্গা প্রসঙ্গে হেমিংওয়ের নোবেল পুরস্কার জয়ী এই উপন্যাসটির কথা উল্লেখ করিনি বিশেষ কারণেই, যদিও ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের কিছু আলচনা পাঠে জানাছিল, এই বিশেষ উপন্যাসের প্রতি সমরেশ বসুর মুগ্ধতার কথা।’

দুটি উপন্যাস এবং বিশেষত দুটি মৃত্যুদৃশ্যের মধ্যে যে গভীর সাদৃশ্য আছে তাঁর কারণ সম্ভবত এই যে দুটি মাছমারাদের নিয়ে উপন্যাস এবং তাদের সংস্কারের জগতেও একটা নিবিড় সাদৃশ্য আছে। মাছের সঙ্গে মাছমারাদের জীবনের একটা সূক্ষ্ম সাদৃশ্য আছে, একথা গঙ্গা উপন্যাসে শৈল্পিক বুননে বুনে যাওয়া হয়েছে। মাছমারারা ঘরে বউ ছেলে রেখে অকূল জলধিতে বেরিয়ে পরে ক্ষুধার তাড়নায়, আর মাছ? তারাও তোমার মতোই বউ ছেলে নাতি নাতনী রেখে এসেছিল ঘরে।’ দুজনের সাদৃশ্য প্রকট হয়ে ওঠে মরণকালে – ‘তুমি মারো মাছ, তোমাকে মারে আর একজন। সংসারের নিয়ম... যার সঙ্গে তোমার বাস, যে তোমার শ্বাস, সেই মাছের সঙ্গে তোমার মরণের সুতো গাঁথা হয়। বাইরে মর আর ঘরেই মর। নিদেনকালে একবার রক্তমাখা মীন চক্ষুর সঙ্গে চোখাচোখি হবে তোমার।’

চোখাচোখি হয়েছিল পাঁচুর। গঙ্গার বুকে নৌকায় সাংলো হাতে পাঁচু। আকাশের বিদ্যুতের চমক। গুরুগর্জনে ডাক ছাড়ছে দূরের আকাশ, সহসা সাংলো খসে পড়ে পাঁচুর অশক্ত হাত থেকে। 'সুরহীন চাপাপড়া' গলায় পাঁচু বলে – 'বাবা বিলেস, আমি মাছমারা। দক্ষিণ থেকে দাদা এসেছে আর এয়েছেন মীনেরা। আমার মরণ হচ্ছে রে।'

মেনে নিতে পারে নি বিলাস, বলেছে, পাঁচুকে ভালো করে খুড়ির কাছে নিয়ে যাবে। 'যেন জলের অতল থেকে তেমনি সুরে বললে পাঁচু, না বিলেস আমার সময় হয়েছে। যত জনাকে মেরেছি, সবাই এয়েছেন।'

পাশাপাশি একটু কান পাতা যাক নিদান কালে হেমিংওয়ের মাছরাঙা বুড়োর চিন্তাধারায় – "You are killing me, Fish, the old man thought. But you have a right to. Never have I seem a greater or more beautiful, or a calmer or more noble thing than, brother come and kill me. I don't care who kills who."

সমরেশ বসুর বৈশিষ্ট্য, শুধু এখানেই শেষ করেননি তিনি, মৃত্যুকালীন মানসিক অবস্থার একটা সার্বজনীন চেহারা তিনি একে দিতে চেয়েছেন, অথচ তা তিনি করেছেন মাছ মারার নিজস্ব সংকীর্ণ জীবন বৃত্তের কথা স্মরণে রেখেই। উপন্যাসে বলা হয়েছে – 'তুমি দেখতে পাওনা, কিন্তু একটা দাগ রেখে যায়।' 'আয়ু শেষের দাগ। নিদেনে দেখতে পাবে তাকে। কেন না, মরণের সময় তোমার গোটা জীবনকে সে দেখাবে।' দেখিয়েছেও। নিদান কালে পাঁচু 'কথা ফুটল না। ঠোঁট কাঁপতে লাগল...বউঠোন পেথম প্রহরের শ্যাল ডাকছে এখন ধলতিতেয়, শুনতে পাচ্ছি গো। হুতোম প্যাঁচাটা ডেকে মরছে কেন, ঠাওর করতে পারছো না? কেন অমন দমকা দমকা বাতাস আছড়ে আছড়ে পড়ছে বেড়ায়, অনুমান করতে পারছ না?' কেন তোমার জায়ের হাত থেকে বাটি খানি পড়ে গেল তাই ভেবে মরছ? ওই জানান দিচ্ছে। পাঁচু তোমাদের ছেড়ে যায়।' এই মৃত্যুর মধ্যে কোনো মহত্ব নেই, কোন বিলাসিতা নেই – পাঁচু যেমন সহজ ভাবে বলেছে ওপারে যাচ্ছি। আর সময় নেই বাপ,' বিলাসও তেমনি একেবারে

নিরলঙ্কার সারল্যে বলেছে, ‘একবারটি এদিকে এসো, খুড়ো আমার মরে গেল।’ সাধারণ মৃত্যুর এই অসাধারণ রূপায়ণ।

১০.২ অনুশীলনী

১) গঙ্গা উপন্যাসের চরিত্র চিত্রণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

২) গঙ্গা উপন্যাসের নিরিখে পাঁচু চরিত্র আলোচনা কর।

৩) গঙ্গা উপন্যাসের প্রেক্ষিতে বিলাস ও নিবারণকে কি পার্শ্ববর্তী চরিত্রের গোত্রে ফেলা যায়। তোমার অভিমত ব্যক্ত কর।

১০.৩ গ্রন্থপঞ্জি

১) গঙ্গা সমরেশ বসু – মৌসুমী পাবলিকেশন।

২) বাংলা সাহিত্য পরিচয়, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তুলসী প্রকাশন।

৩) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দেবেশ কুমার আচার্য, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি।

উপসংহার

শেষ কথা বলতে গিয়ে সমরেশ বসুর সম্পর্কে কিছু ভিন্ন রকমের কথা বলতেই হচ্ছে, শেষ জীবনের কিছু ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ও কাজকর্ম।সমরেশ বসুর দীর্ঘ প্রতীক্ষিত রামকিঙ্কর বেজ-এর জীবনভিত্তিক সুদীর্ঘ উপন্যাস ‘দেখি নাই ফিরে’ দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। মাস ছয়েকের মধ্যে উপন্যাস বেশ খানিকটা অগ্রসর হয়েছে। বাবা থাকতে এলেন যাদবপুরে আমাদের কাছে। তখন ওঁর শরীর ভাল যাচ্ছে না। দু’বার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। এ দিকে বিগত আট-দশ বছর ধরে বাবা প্রায় চিরুনি তল্লাশির মতো তন্নতন্ন করে রামকিঙ্করের জীবন, মেধা-মনন ও সময় সম্পর্কে তথ্য আহরণ প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছেন। আর ঠিক সেই সময়ই শরীর বাধা হয়ে দাঁড়াল। আমরা তখন প্রান্তবাসী। আমি ও আমার স্ত্রী রাখি দু’জনেই চিকিৎসক। যাদবপুরে আমার শ্বশুরালয় সংলগ্ন জমিতে একটি ছোট নার্সিংহোম তৈরি করেছি। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ নিজেরাই করি। ওই

নার্সিংহোমে বিদেশ থেকে নেবুলাইজার পাম্প সহ আরও বেশ কিছু উন্নত যন্ত্রপাতি এনেছিলাম। সেই সময় বাবার চিকিৎসা করতেন কলকাতার নামী চিকিৎসকরা। বাবার শ্বাসকষ্টের জন্য ওগুলো ব্যবহার করা হত খ্যাতনামা ডাক্তারদের পরামর্শে। মানুষটা বেশ স্বস্তি পেতেন তাতে, আর আমরাও। রামকিঙ্কর বেজ ছাড়া বাবার মাথায় তখন আর কিছু ছিল না। কোথায় যেন একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে ফেলেছিলেন। জীবনধর্মী উপন্যাস লেখার একেবারে পরিকল্পনাপর্বে সত্যজিৎ রায় পরামর্শ দিয়েছিলেন বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে লেখার জন্য। বাবা ভেবেছিলেন, কিন্তু স্থিতধী হয়েছিলেন নিজের ভাবনা ও উপলব্ধির উপর। মানুষ এবং শিল্পী হিসেবে রামকিঙ্কর অনেক বলিষ্ঠ চরিত্র বলে বাবা মনে করেছিলেন। রামকিঙ্করের প্রসঙ্গে বাবার বলা কিছু কথা আজও আমার মনে পড়ে। তিনি বলতেন, ‘‘রামকিঙ্কর যেন এক বিশাল ঠাকুরের মূর্তি আমার ঘাড়ে... বিসর্জন দিতে পারব, না কি দিতে গিয়ে আমিই তলিয়ে যাব...ভাবি মাঝে-মাঝে।’’ আরও একটি কথা বলতে শুরু করেছিলেন, ‘‘শান্তিনিকেতন এবং তখনকার নানান লোকজন সম্পর্কে যে সব তথ্য পেয়েছি ... কাহিনি ঘটনা হিসাবেও সে সব সাগরদা দেশে ছাপতে পারবেন কি না কে জানে?’’ তৃতীয় পর্ব ‘রৌদ্রদগ্ধ দীর্ঘ বেলা’য় শুরু হচ্ছে রামকিঙ্করের পূর্ণ যৌবন কালের কথা। এই বারেই তো সেই সব কথা আসবে। আজ ভাবি, ঈশ্বরের কী বিচিত্র বিচার! এই তৃতীয় পর্ব সূচনার গোড়াতেই বাবার কলম থেমে গেল। অসমাপ্ত থেকে গেল বাংলা সাহিত্যের একটি কালজয়ী নির্মাণ। জানতে পেরেছিলাম ‘দেখি নাই ফিরে’ উপন্যাসের পাঁচটি পর্বের নামকরণ করেছিলেন এই রকম, ‘আরক্ত ভোর’, ‘সকালের ডাক— বিশ্বঅঙ্গনে’, ‘রৌদ্রদগ্ধ দীর্ঘ বেলা’, ‘ছায়া দীর্ঘতর’ এবং ‘অন্ধকারের আলো’। রামকিঙ্করের জীবনের গতি ও চলন অনুযায়ী ওই নামকরণ ও পর্বভাগ।

একক ১১ - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জীবন ও সাহিত্যসৃষ্টি

বিন্যাস ক্রম

১১.১ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জীবন ও সাহিত্যসৃষ্টি

১১.২ লেখক জীবনের আরম্ভের কথাসাহিত্যসৃজনের বিপুল সম্ভার (উপন্যাস ও ছোটগল্প)

১১.৩ অনুশীলনী

১১.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১১.১ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জীবন ও সাহিত্যসৃষ্টি

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর (১৯১২-৮২) জন্ম ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায়। একই জেলায় আরেক প্রবাদপুরুষ সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-৫১) জন্মেছিলেন। মল্লবর্মণের মতো নন্দীও দারিদ্র্য আর অভাব নিয়ে জন্মেছিলেন। ১৯৩৬ সালে মাত্র চবিবশ বছর বয়সে তাঁর ছোটগল্প 'নদী ও নারী' পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশের পরপরই গাল্পিক হিসেবে নাম ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর প্রিয় কবি জীবনানন্দ দাশ আবার কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র। আত্মকেন্দ্রী-নির্জন আত্মনিবাসী এবং কবিতাকেন্দ্রী হয়েও তিনি যে-জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তা এককথায় বৈচিত্র্যময়। তাঁর গল্প-উপন্যাসের চরিত্রগুলো এসেছে নিম্নবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের বিচিত্র এলাকা থেকে। কখনো মনে হয়েছে তারই মতো ভেসে এসেছে কুলহারা-স্বজনহারা সব, ১৯৩৪ সালে জীবিকার সন্ধানে কলিকাতায় (কলকাতা) চলে যান, কলকাতা গিয়েও প্রথম জীবনে দীর্ঘসময় টিউশনিই ছিল তাঁর পেশা, যদিও অনেক পরে সাংবাদিকতার পেশাকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেন। নির্লিপ্ত আর নির্জনতাপ্রিয় মানুষটি জীবনের অনেকগুলো বছর ক্ষুদ্র পরিসরের মেসবাড়ির জীবন অতিবাহিত করেছেন এবং

সেখানকার কত বাস্তব জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন; কত সমস্যা কত কাহিনির জন্ম তিনি দেখেছেন এখানে। মানুষ এবং মানুষের বিচিত্র ঘটনা-উপঘটনা এবং তাদের সংগ্রামমুখর পথচলা সবই তার হৃদয়কে স্পর্শ করে গেছে। তাদের পেশা-বয়স-মানসিকতা সবই ভিন্ন, বারো ঘর এক উঠোন (১৯৫৫) উপন্যাসে বস্তিজীবনের কাহিনি বিধৃত। উপন্যাসটি একটি স্মারক স্তম্ভ। নিম্নমধ্যবিত্ত নগরবাসী বাঙালির অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং নৈতিক অবক্ষয় নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী উপন্যাসে তৎকালীন বাংলাদেশের রূপক নির্মাণ করেছেন নির্মম ও দুঃসাহসিকতায় এবং সে-নিরাসক্তি প্রায় নিষ্ঠুরতার শামিল। তাকে তিনি প্রজ্বালিত অগ্নিগিরির মতো জ্বালিয়ে রেখেছিলেন উপন্যাসে। বিংশ শতকের ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে বাংলা সাহিত্যের জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটা যুগ।

আজীবন স্বপ্ন দেখেছেন লেখকই হবেন। শুধু মাত্র লেখার প্রয়োজনে বস্তিতে থাকতে পর্যন্ত কার্পণ্য করেননি। বরাবর বিশ্বাস করেছেন, সমস্ত মতামতের মধ্যেও শিল্পীকে অবিচল থাকতে হবে, পরের সৃষ্টির দিকে এগিয়ে যেতে হবে। ফেসবুক-ধ্বস্ত যুগে যে সাহিত্যদর্শন বিলুপ্তপ্রায়! তিনি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী।

মাঝখানে একফালি রাস্তা পুকুরঘাটে যাওয়ার। রাস্তা ঘেঁষে পুঁইমাচা। ওই মাচার কাছেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে সে। দু'চোখ ভরে যে কী দেখছে কে জানে! চার বছর তো মাত্র বয়স। মা এসে এক বার ডেকে গেল, 'কী রে কী দেখছিস!' এক এক করে ঠার্কুদা-ঠানদি-কাকা-পিসিরা। কিন্তু মুখে রা নেই ছেলের।ছোটকাকা বললেন, ধনু আকাশ দেখছে। অন্যরা বললেন, ফড়িং দেখছে ও। শুধু মা-ই বুঝতে পারছে ছেলের মন ভাল নেই। মা-রা আসলে সব কিছু বোঝেন! কিন্তু মন খারাপ কেন ধনুর?

আসলে যে যে কারণ আর গন্ধ থেকে ভাললাগা তৈরি হয়, তখনও ওই ছোট্ট ছেলের জগতে তা তৈরি হয়নি। ছোটবেলার ধনু, বড় হয়ে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী নিজের সেই বিস্ময় নিয়ে লিখবেন, 'আজ আমি বুঝি তখনও আমার ভাল লাগার বোধ জন্মায়নি। ...কোন্ দৃশ্য, কোন্ শব্দ— কিসের গন্ধ আমাকে আনন্দ দেবার জন্য অপেক্ষা করছিল তখনও জানতে পারিনি, বুঝতে পারিনি।' আর সেই না বোঝাকেই আজীবন বুঝতে

চেয়েছিলেন লেখক জ্যোতিরিন্দ্র, একের পর এক লেখায়। কখনও তাঁকে বলা হয়েছে যে তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লেখেন, কখনও বলা হয়েছে লেখার মাধ্যমে আদর্শ প্রচার করছেন। কিন্তু সে সব কিছুকে প্রবল ভাবে অস্বীকার করেছেন জ্যোতিরিন্দ্র। শুধু বিশ্বাস করেছেন, 'মনে হয়, কোনো রচনাই 'নিখুঁত' হল না 'সর্বাঙ্গীণ সুন্দর' হল না— আরও ভাল করে লেখা উচিত ছিল।'

প্রাতর্ভ্রমণের নেশা ছিল ঠার্কুদার। ঠার্কুদার হাত ধরে রেললাইন পার হয়ে একদম শহরের শেষ সীমায় এক খালের কাছে সে দিন চলে গিয়েছিল ধনু। তার পর সেখান থেকে খালের ধারে হেলিডি সাহেবের বাংলোর কাছে এক ফুলবাগানে। বুড়ো দারোয়ান ঠার্কুদাকে খুব ভালবাসতেন। দারোয়ান গেট খুলে দিলেন। কিন্তু বাগানে ঢুকেই চমকে উঠল ধনু। এই, এই বুঝি সেই অবিশ্বাস্য! ধনুর মাথার সামনে একটা গাছের দুটো ডালে দুটো সদ্য ফোটা গোলাপ। একটু একটু শিশির লেগে রয়েছে পাপড়ির গায়ে। সূর্য উঠছে সবে। তার রক্তাভ আলো এসে পড়েছে পাপড়িতে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই একটি নীল প্রজাপতি একটা কলির বোঁটায় এসে বসল। পলক পড়ছে না ধনুর। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ভিতরটা কী রকম করছে যেন।

জ্যোতিরিন্দ্র লিখছেন, 'ভাললাগা কাকে বলে, ভাল দৃশ্য কী সেদিন প্রথম টের পেলাম। আর গন্ধ। নির্জন ঊষার সেই বাগানে গোলাপের মৃদু কোমল গন্ধে আমার বুকের ভিতর ছেয়ে গেল। সেই গন্ধ বুকে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। যেন একটা আশ্চর্য সম্পদ আহরণ করে বাড়ি ফিরলাম।'বুকের মধ্যে বয়ে নিয়ে আসা প্রকৃতির গন্ধের সঙ্গে সেই যে সম্পর্কের শুরু, তা আজীবন বয়ে নিয়ে চলেছেন তিনি। আমৃত্যু। আসলে এক এক জনের স্মৃতি এক এক জিনিসের অনুরণন নিজের মতো করে ধরে রাখে। কখনও কোনও দৃশ্য, কখনও গন্ধ, কখনও আবার রং, এক এক জনের ক্ষেত্রে স্মৃতির অনুষঙ্গের বিষয়গুলি এক এক রকম। জ্যোতিরিন্দ্রের কাছে তা ছিল গন্ধ। তিনি প্রয়োজন মতো সেই সব স্মৃতির অনুষঙ্গে ডুব দিয়েছেন। ডুব দিয়ে কখনও 'ভাদ্র মাসে জলে ডোবানো পাটের পচা গন্ধ থেকে বা অঘ্রাণের পাকা ধানের গন্ধ থেকে বা কখন আবার পুঁটি, মৌরলা মাছের আঁশটে গন্ধ' থেকে সৃজনের প্রয়োজনীয় উপকরণটুকু নিয়ে

উঠে এসেছেন। সকলের চোখের আড়ালে গিয়ে বসে পড়েছেন নিজের লেখার খাতার সামনে। তার পর পাতা জুড়ে জন্ম নিয়েছে একের পর এক দৃশ্যাবলি। 'বুটকি-ছুটকি', 'গিরগিটি', 'বনের রাজা'-সহ অনেক গল্পে ফিরে ফিরে এসেছে ছোটবেলার নানা রকম গন্ধের স্মৃতি। জ্যোতিরিন্দ্রের নিজের কথায়, 'সব ক'টা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সেই শৈশব থেকে আমার নাকটা অতিমাত্রায় সজাগ সচেতন। পরবর্তী জীবনে সাহিত্য সৃষ্টি করতে গিয়ে এই গন্ধ আমাকে অনেক সাহায্য করেছে।'

অথচ যখন তা সৃষ্টি হচ্ছে, তখন পাশের জন, একান্ত জন ঘুণাক্ষরেও টের পাচ্ছেন না লেখার খাতায় কী জন্ম নিচ্ছে! এতটাই নিভৃত সে শব্দযাপন! শুধু মাত্র তাঁর কয়েকটি অভ্যেসে কাছের জনেরা বুঝে নিতেন লেখার কোথাও আটকেছে! লেখার কোথাও আটকালেই উঠে গিয়ে দু'তিন গ্লাস জল খেতেন, দুটো পান খেতেন, ঘরের মধ্যে পায়চারি করে নিতেন কয়েক বার, বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতেন। জটটা খুললেই আবার ফিরে আসতেন লেখার টেবিলে। এসে আধশোওয়া হয়ে বসতেন কেদারায়। সামনের দক্ষিণ দিক পুরো খোলা। সেখান থেকে প্রচুর আলো এসে পড়ছে ছিপছিপে একহারা চেহারায়। তিনি ভাবছেন আর লিখছেন। হঠাৎ করেই হয়তো মেয়ে-স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতেন, "অমুক চরিত্রের কী নাম দেওয়া যায় বলো তো?" তাঁরা হয়তো নাম বলতেন দু'-একটা। কিন্তু কোনওটাই মনঃপূত হতো না তাঁর। স্ত্রী হয়তো জিজ্ঞেস করলেন, "ওই গল্পটার নাম কী দিলে?" নিরাসক্ত গলায় উত্তর আসত, "সে পরে দেখবে'খন।" আসলে নিজের লেখা নিয়ে আগাম কিছু বলাটা মোটেই পছন্দ করতেন না।

স্ত্রী পারুল নন্দীর স্মৃতিচারণায় উঠে এসেছে সে প্রসঙ্গ,—'তারপর যখন লেখাটা ছাপা হল, দেখলাম ফাইনাল চেহারাটা কী দাঁড়িয়েছে। বারান্দায় ঝুকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। হঠাৎ বললেন, একটা ভাল প্লট মাথায় আসছে জান। ব্যস, ঐটুকুই। তারপর শুধু লেখা।'

১৯১২ সালে অবিভক্ত বাংলার কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র। বাবা অপূর্বচন্দ্র নন্দী ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উকিল। কিন্তু উকিল বা অন্য কোনও পেশা নয়। লেখক হবেন, এটাই স্বপ্ন ছিল বরাবর। ১৯৮২ সালে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সে স্বপ্ন পূরণে

কার্পণ্য করেননি কখনও। এমনকি, লেখার জন্য বেছে নিয়েছিলেন বস্তি এলাকাও। এমনিতে সারা জীবনে সাত-সাত বার ভাড়া বাড়ি পাল্টেছিলেন। চাকরি পাল্টেছেন একাধিক বার। কিন্তু যেখানে গিয়েছেন সেখান থেকেই সংগ্রহ করেছেন সৃজনী-উপকরণ। পারিবারিক সূত্র জানাচ্ছে, মেয়ের বয়স তখন মাত্র চার বছর। বেলেঘাটার বারোয়ারিতলায় একটা বস্তি দেখে এসেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র। হঠাৎ করেই স্ত্রীকে এসে বলেছিলেন, ‘‘ওই বস্তিতে থাকতে হবে আমাদের। লেখার প্রয়োজনে।’’ তার পরে লেখার তাগিদেই থাকা শুরু ওই বস্তিতে। বাড়ির মাঝখানে বড় উঠোন। ভাড়াটে সব মিলিয়ে মোট এগারো ঘর। সকলের ব্যবহারের জন্য ওই একটিই উঠোন। কেউ কাজ করতেন দোকানে, কেউ আবার ছিলেন নার্স। বেশির ভাগই ছিলেন পূর্ববঙ্গের। ওখানে থাকাকালীনই সকলের হাবভাব খুঁটিয়ে দেখা শুরু করলেন। দেখতে থাকলেন আচার-আচরণ, জীবনযাত্রা। সে সব অভিজ্ঞতা, স্মৃতি তার পরে হ্যারিকেনের আলোয় বসে বসে লিখেছিলেন। জন্ম নিয়েছিল ‘বারো ঘর এক উঠোন’।

বিলাসিতা নেই, বন্ধুবান্ধব নেই, আড্ডা নেই, অহেতুক সময় নষ্ট নেই। অন্তর্মুখী অথচ স্পষ্টবক্তা, গভীর অথচ সূক্ষ্ম রসবোধ রয়েছে, যাঁরা জ্যোতিরিন্দ্রকে কাছ থেকে চিনতেন, তাঁদের কাছে এমন ভাবেই ধরা দিতেন তিনি। যেমন বিয়ের জন্য পাত্রী (পারুল নন্দী) দেখতে গিয়েছেন। পাত্রী দেখা শেষের মুখে। হঠাৎ কোনও রকম ভনিতা ছাড়াই পাত্রীর দাদাকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন, ‘‘আমি কত মাইনে পাই জানতে চাইলেন না তো!’’ পাত্রীর দাদা একটু বিব্রত। কিন্তু তাঁকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে জ্যোতিরিন্দ্র নিজেই বলে দিলেন, ‘‘আমি মাইনে পাই একশো তিরিশ টাকা।’’ মেয়ের বাড়ির সকলে একটু অবাকই হয়েছিলেন। কিন্তু খুব একটা গুরুত্ব দেননি জ্যোতিরিন্দ্র। আবার পারিবারিক সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, বিয়ে করতে গিয়েছেন তিনি। একরাশ ঝাঁকড়া চুল, সাজগোজের মধ্যে শুধু লন্ড্রি থেকে কাচানো নতুন ধুতি-পাঞ্জাবি। ব্যস, ওইটুকুই। দেখে বোঝার উপায় নেই যে, তিনিই বর!সাদামাঠা ওই ভাব আজীবন সঙ্গী ছিল তাঁর। যেমনটা সঙ্গী ছিল নিয়মানুবর্তিতা। চূড়ান্ত আর্থিক কষ্ট, অনটনেও নিয়মানুবর্তিতায় কোনও খাদ ছিল না। সে এক মেয়ে ও দুই ছেলের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনই হোক

কিংবা লেখাই হোক না কেন। লেখা আসুক আর না আসুক, রোজ নিয়ম করে লেখার খাতার সঙ্গে তাঁর সময় কাটানো চাই-ই চাই। পারুল নন্দীর স্মৃতিচারণা অনুযায়ী, ‘লেখার সময়ও ছিল অত্যন্ত বাঁধা। যখনই মনে হল তখনই লিখতে বসলাম একদম পছন্দ করতেন না। যখনই মনে হল রাতে বাড়ি ফিরলাম একদমই পছন্দ করতেন না। আমার স্বামী নিজেই ঘড়ি হয়ে যেন নিজেকে এবং সেই সঙ্গে সংসারটিকে চালনা করতেন।’সকালে ও বিকেলে দু’বেলা নিয়ম করে হাঁটতে যেতেন। কিন্তু ওই হাঁটার সময়ে খুব একটা কথাবার্তা পছন্দ করতেন না। মনে করতেন, সাধারণ কথা-গল্পের চেয়ে ওই সময়ে যদি কোনও গল্প-উপন্যাসের ভাবনা তাঁর মাথায় আসে, তাতেই অনেক লাভ! লেখার জন্য এ ভাবেই নিজেকে একা করেছেন, বিযুক্ত করেছেন সকল কিছুর থেকে। ফেসবুক-ধ্বস্ত এ সময়ে লেখার জন্য নিজেকে নিঃসঙ্গ করার এই কৃচ্ছ্রসাধনের রীতি প্রায় বিরল। এ ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্রের দুই পুত্র দীপঙ্কর ও তীর্থঙ্করবাবুর দু’জনেরই বক্তব্য এক। তাঁরা বলছেন, ‘‘শুধু লেখা নয়, তাঁর মতো এক জন ডিসিপ্লিনড মানুষ আমরা সারা জীবনে দেখিনি। স্নান-খাওয়া, বই পড়া থেকে শুরু করে লেখা, এমনকি, বাজার করাও ছিল ঘড়ি ধরে। উচ্ছৃঙ্খল জীবন কী, তা তিনি জানতেন না।’’কবিতা লিখে শব্দ-সহবাস শুরু হয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্রের। কিন্তু কোথাও কিছুর একটা অভাব বোধ করছিলেন তিনি। কী যেন তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। ‘গদ্য চাই। গদ্য খুঁজছি।’ তাই আতিপাতি করে বই খোঁজা শুরু হল। বাড়িতে কারও সাহিত্যচর্চা ছিল না সে ভাবে। ফলে বই খুঁজে পেতে প্রথমে একটু হোঁচটই খেতে হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাবার টেবিলের উপরে আইনের বইয়ের পাশেই মিলল সেই অমূল্য ধন! তিনটি উপন্যাস। তখন বয়স মাত্র এগারো থেকে বারো। রুদ্ধশ্বাসে পড়া হয়ে গেল রমেশচন্দ্র দত্তের লেখা সে তিন উপন্যাস। তার মধ্য দিয়েই যেন সাবালক হল সাহিত্যপাঠ। ধনু আর এখন পুকুরঘাটে যাওয়ার রাস্তার পাশের পুঁইমাচার সামনে একা একা দাঁড়িয়ে থাকে না। উপন্যাস-গল্পের বইয়ের পাতা থেকে বেরিয়ে

চরিত্রেরা তখন তার সঙ্গে যেন কথা বলে, গল্প করে। কিন্তু তাতে বিপদ হল এক দিন। বাবার বন্ধু বাড়িতে এসেছেন। তখন ধনু বসে উপন্যাস পড়ছে। সামনে আরও দু’-চারটে উপন্যাস-গল্পের বই ছড়ানো। বাবার বন্ধু তো দেখে অবাক। এগারো-বারো

বছরের ছেলে এ রকম উপন্যাস পড়ছে! ‘‘এত অল্প বয়সের ছেলেকে এ সব উপন্যাস-টুপন্যাস পড়তে দেবেন না,’’ বলে তিনি চলে গেলেন। ‘অবাক হলাম বাবাকে দেখে। তিনি কিন্তু একবারও আমাকে বললেন না যে এখনও তোমার উপন্যাস পড়ার সময় হয়নি’, নিজের বাবা সম্পর্কে লিখছেন জ্যোতিরিন্দ্র। আবার তাঁর (জ্যোতিরিন্দ্র) পুত্র তীর্থঙ্করবাবু বলছেন, ‘‘বাবার সঙ্গে লেখা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করেছি। তিনি কথা শুনেছেন মন দিয়ে। মনঃপূত না হলে তখন নিজের মতটা বলেছেন।’’ আসলে নিজের বাবার কাছ থেকে মুক্তমনা সংস্কৃতির যে শিক্ষা পেয়েছিলেন, তা থেকে বিচ্যুত হননি জ্যোতিরিন্দ্র।ক্রমশ গদ্যই সঙ্গী হয়ে গেল জ্যোতিরিন্দ্রের। প্রথমে অমুক সমিতি, তমুক ক্লাব, এ পাড়া, ও পাড়ার হাতে লেখা কাগজে গল্প পাঠানো চলছিল নিয়মিত। ছোট হলেও একটা নির্দিষ্ট বৃত্তে আস্তে আস্তে তৈরি হচ্ছিল গল্পকারের পরিচয়। এই করতে করতে স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে গেল। কলেজে পড়াকালীন মঁপাসার একটা গল্প অনুবাদ করে ঢাকার এক পত্রিকায় পাঠিয়ে দিলেন তিনি। সেটি ছাপা হল। ছাপার হরফে সেই প্রথম নিজের নাম দেখলেন জ্যোতিরিন্দ্র। সে কী আনন্দ! তার এক মাস পরেই ওখানে একটি মৌলিক গল্প পাঠালেন। ছাপা হল সেটিও। এর মধ্যেই ঘটল সেই ঘটনা। স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করার জন্য তাঁকে সন্ত্রাসবাদী অ্যাখ্যা দিয়ে গ্রেফতার করা হয়! জ্যোতিরিন্দ্র লিখেছেন, ‘সন্ত্রাসবাদী সন্দেহে পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করে। চার মাস জেলে আটক করার পর আমাকে স্বগৃহে অন্তরীন করা হয়।’ শুধু অন্তরিন করে রাখাই নয়, চাপল সরকারি নিষেধাজ্ঞাও—কোনও পত্রপত্রিকায় লেখা যাবে না। কিন্তু মাথার মধ্যে শব্দেরা যে ভর করছে, ভনভন করছে তারা। অতঃপর ‘জ্যোৎস্না রায়’-এর আগমন ধরণীতে! ‘জ্যোৎস্না রায়’ ছদ্মনামেই চলল সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি। কিন্তু সে সব লেখার কিছুই নিজের কাছে রাখা গেল না। দেশভাগ হল। ও পার বাংলার আলমারিতেই পড়ে রইলেন ‘জ্যোৎস্না রায়’!

১১.২ লেখক জীবনের আরম্ভের কথা

১৯৩৬ সাল। কলকাতায় চলে এলেন জ্যোতিরিন্দ্র। শুরু হল লেখকজীবন। পাইস হোটেলে খাওয়া, পড়া, দু’-একটা টিউশন আর লেখা— এই ছিল নিত্যদিনের রুটিন।

সিনেমা নয়, খেলা দেখা নয়, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা নয়। প্রত্যেক দিন শুধু নিয়ম করে লেখা চলত। পড়িয়ে আয় হত ওই বাইশ-তেইশ টাকা। হোটেলে থাকা-খাওয়া বাবদ বারো-তেরো টাকা দিতে হত। ধোপা-নাপিত-বিড়ি-পান সব মিলিয়ে যা আনুষঙ্গিক খরচ, ওই আয়ের মধ্যেই হয়ে যেত। প্রেমেন্দ্র মিত্র নিজের সাপ্তাহিক পত্রিকায় জ্যোতিরিন্দ্রের বেশ কয়েকটি ছোট গল্প ছাপলেন। 'পূর্বাশা' ও 'অগ্রগতি'তেও ছোটগল্প বেরোল। তার মধ্যেই এক সংবাদপত্রে সাব-এডিটরের চাকরি পেয়ে গেলেন জ্যোতিরিন্দ্র। অল্প কয়েক দিনের চাকরি। কিন্তু ওই সময়ের মধ্যে 'দেশ' পত্রিকায় আরও একটি গল্প বেরোল। একে একে 'মাতৃভূমি', 'ভারতবর্ষ', 'চতুরঙ্গ', 'পরিচয়'-সহ একের পর এক পত্র-পত্রিকায় গল্প বেরোতে থাকল। বন্ধুদের মধ্য থেকে দাবি উঠল উপন্যাসের। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র তখনও প্রস্তুত নন। তাঁর কাছে 'উপন্যাস তো একটা প্রকাণ্ড ইমারত। আর ছোটগল্প সেই ইমারতের ইট।' ওই ইটগুলো একের পর এক সাজিয়ে উপন্যাস তৈরি করতে হয়।অতঃপর সাগরময় ঘোষের সেই চিঠি। ছোটগল্প চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন সাগরময় ঘোষ। সঙ্গে লিখলেন— 'এবার উপন্যাসে হাত দাও।' ব্যস! জ্যোতিরিন্দ্র লাফিয়ে পড়লেন উপন্যাসে। এত দিন ছোটগল্প লিখে তিল তিল করে যে শব্দবিন্যাস তৈরি করেছেন, তাই উজাড় করে দিলেন নিজের প্রথম উপন্যাসে। 'সূর্যমুখী' সম্পূর্ণ হল। 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হল সে উপন্যাস। প্রকাশ হওয়ার পরে তা নিয়ে প্রশংসা জুটল, নিন্দা জুটল তার চেয়েও বেশি। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র থামলেন না। 'সূর্যমুখী'র পরে 'মীরার দুপুর', তার পর 'বারো ঘর এক উঠোন'। 'বারো ঘর এক উঠোন' তাঁকে খ্যাতি দিল, পরিচিতি দিল, প্রতিষ্ঠা দিল। তবে অনেক সমালোচক জানালেন, লেখক ওই উপন্যাসে শুধু অন্ধকারই দেখেছেন। নিজে যেমন আলো দেখতে পাননি, তেমনই একটি চরিত্রকেও আলোয় উত্তরণ করাতে পারেননি। সমালোচকদের যাবতীয় আক্রমণ, নিন্দাপর্ব মেটার পরে, 'বারো ঘর এক উঠোন'-এর হয়ে কলম ধরেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র। লিখেছিলেন, 'আলো দেখাবার জন্য উত্তরণ

দেখাবার জন্য আমি এ-বই লিখিনি। কেননা আমার দেখা ও জানা চরিত্রগুলির মধ্যে এমন একটি মানুষও ছিল না, যে এদের মধ্যে উপস্থিত থেকে মহৎ জীবনাদর্শের বাণী

শোনাতে পারত। বিপন্ন, বিপর্যস্ত, অবক্ষয়িত সমাজের মানুষগুলি শুধু বেঁচে থাকার জন্য, কোনোরকমে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কতটা অন্ধকারে, কতটা নিচে নেমে যেতে পারে আমি তাই দেখিয়েছি।'গল্প-উপন্যাসের যে-জন্মবেদনা এবং সাহিত্যিকদের উঠে আসার সময়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯২৪-২৮) শুরু এবং শেষের সীমা নির্দিষ্ট ছিল পাশ্চাত্যে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ১৯৩৯, যার শেষ হয় ১৯৪৫ আনুষ্ঠানিকভাবে। ১৯৪৩-এর প্রথম দিকে প্রাকৃতিক ঝড়, দুর্যোগ এবং মন্বন্তর, ১৯৪৬-এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বাস্তুহারাদের সহায়-সম্বল হারানোর তীব্র বুকভাঙা যন্ত্রণা, ১৯৪৭-এ দেশভাগ, দুটো স্বাধীন দেশের মানচিত্র অর্থাৎ ধর্ম এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার ওপর ভিত্তি করে স্বাধীনতা, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বিভাজিত দেশের উদ্বাস্তু সমস্যা – সেই গভীর সমস্যা থেকে অবক্ষয়-অনন্বয়-অস্তিত্বের সংকট, উদ্ভব ঘটে নতুন ধনিকশ্রেণির, প্রান্তিক মানুষকে চুষে খাওয়ার সেই রক্তচোষার দলেরা ঐক্যবদ্ধ হয়। মুখোশ খুলে সামনে এসে দাঁড়ায় পুঁজিবাদি-কালোবাজারি-মুনাফাখোর-মজুতদার-দাদন ব্যবসায়ী – ১৯৫০ অবধি এদের দৌরাত্ম্যের কাছে হার মানে রাষ্ট্র, ক্রমে ক্রমে তা আবার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। এ-সময় মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে ওঠে। ভাত-কাপড়-বাসস্থানের অভাবের সঙ্গে আরো কিছু প্রয়োজনীয় অভাব দেখা দেয়। বাঁচার মতো বাঁচার জন্য বিনোদন-সংস্কৃতি চায়। এ-সময়ে মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজ থেকে গজিয়ে ওঠেন একঝাঁক সাহিত্যিক। মূলত যাঁরা সাহিত্য-সংস্কৃতির নেতৃত্বে আসীন হন, তাঁদের পদচারণে এ-সময় বাংলাসাহিত্যের ভূমি উর্বর হয়। নতুন অভিনব জীবনের কথাকাররা বেরিয়ে আসেন তিক্ত-অভিজ্ঞতায় বলিষ্ঠ হয়ে। কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-৭৬) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-হুমায়ুন কবীর-নরেন্দ্রনাথ মিত্র-অমিয়ভূষণ মজুমদার-শওকত ওসমান-কমলকুমার মজুমদার-আবুল ফজল-সন্তোষকুমার ঘোষ-আবু জাফর শামসুদ্দীন-মনোজ বসু-আবু রুশদ-অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়-জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী-সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ-শাহেদ আলী-নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-সরদার জয়েনউদ্দীন-সমরেশ বসু-গোলাম কুদ্দুস-আবদুল জববার-সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ প্রমুখ। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প বা উপন্যাসে ব্যক্তিক ও পারিবারিক অস্তিত্বের সংকট নিয়ে যে-কাহিনি গড়ে তুলেছেন তা এককথায় মর্মস্পর্শী বা হৃদয়স্পর্শী বলা অপেক্ষা রাখে না। তাঁর রচনার বিষয়ে

প্রবলভাবে অপবাদ দেওয়া হয় যে, তিনি কবিতা দ্বারা আক্রান্ত-অধিকৃত। কথাটা হয়তো পুরোপুরি সত্য। এও তো চিরসত্য, তাঁর লেখা বাস্তবতা থেকে কখনো বিচ্যুত হয়নি। তাঁর প্রিয় কবি জীবনানন্দের মতোই জ্যোতিরিন্দ্র চিত্রময়তাকে আশ্রয় করে এগিয়ে যান, যার কারণে চিত্রকল্প-চিত্রকলা উপমা-রূপক প্রতীক ইত্যাদি কবিতার অলংকার গদ্যে অবিরল ধারায় বহুল ব্যবহার করেছেন। তাতে অবশ্যই রচনার মান উতড়ে গেছে। বিভূতিভূষণের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কবিতা-আশ্রিত ভাষা। তাতে কি তাঁর রচনার মান নেমে গেছে কেউ বলবেন, বরং তার ভাষাশক্তিতে বলীয়ান হয়েছে গল্প-উপন্যাসগুলো। এরিস্টটল বলেছেন, 'কাহিনির চরিত্রগুলো থেকে আমরা গুণাবলির পরিচয় পাই। পাই তাদের ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে। আর আমরা যা করি, তা হচ্ছে, হয় আমরা এতে সুখী হই, নয়তো এর বিপরীতটাই ঘটে।' জ্যোতিরিন্দ্রের সাহিত্যের প্রধান বিষয় যদিও মানুষ এবং প্রকৃতি। তাঁর তাবৎ চরিত্রে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকে। কিন্তু তিনি কখনো শ্রেণিসংগ্রামের কথা ভাবেননি। তার প্রকৃতি বাস্তবিকই নিজের অর্থাৎ স্বতন্ত্র, রবীন্দ্রনাথ বা বিভূতির প্রকৃতির মতো এক নয়। তাই তো দেখা যায় মানুষ এবং প্রকৃতিকে তিনি একটা সামান্তরালে এনে দাঁড় করিয়েছেন। এও সত্য, তাঁর রচনা যৌনতায় ভরপুর; অনেকটা যৌনতাই উপজীব্য যেন। তার পরও তাঁর মানুষ, তাঁর প্রকৃতি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ বা প্রকৃতিকে নিজের মতো করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমানভাবে (গল্প-উপন্যাসে) স্থান দিয়েছেন। শুধুমাত্র পটভূমিকায় বিরাজিত নয়, প্রকৃতি কখনো নিষ্ঠুর – শুধুই পেলব নয়, মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি যেমন, বিমুগ্ধতা তাকে বিবরে অথবা কোটরে প্রবেশ করিয়েছে, চরিত্র হয়েছে সজীব-সাবলীল। তাই তাঁর গল্প-উপন্যাস আকাশপ্রমাণ সাফল্য বয়ে এনেছে। সত্তর বছরের আয়ুষ্কালে দরিদ্রতা-স্বেচ্ছাবৃত-নিঃসঙ্গতায় কেটেছে। মন্বন্তর-মহামারি-দাঙ্গা-দেশভাগের কারণে জন্মভূমির মায়া ত্যাগ। এর মধ্যে প্রায় পঞ্চাশটি উপন্যাস এবং কুড়িটির মতো গল্পগ্রন্থ রচনা করেছেন এবং আরো অজস্র অগ্রন্থিত রচনা রয়েছে। নিম্নবিত্তরা তাঁর অধিকাংশ রচনার কেন্দ্রীয় চরিত্র। আজীবন তিনি একাকিত্বের সাধনা করেছেন, যা তাঁর রচনাতেও প্রতিফলিত। গল্পের গভীরের শক্তিকে বিস্ময়করভাবে স্পর্শ করতে পেরেছেন, যা নিঃশব্দে সেই মুখোশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পেরেছেন

বিভূতিভূষণ-জীবনানন্দ-প্রেমেন্দ্র-তারাশঙ্কর এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। নন্দীর গল্প-উপন্যাসেও সেই শক্তির ঘ্রাণ পাওয়া যায়। জটিল অনুভবের দোটানায়, মানবিক সম্পর্কের অচেনা হাতছানি, জীবনের কঠিন বেড়াজালের সুখানুভূতির স্পর্শে, আত্মিক নিষ্কৃতির চোরাটানে নন্দীর কাহিনি কাঠামো পেয়ে যায় বলেই হয়তো সিদ্ধলাভ করেছে তাঁর গল্প-উপন্যাস। নতুন রীতি বা আঙ্গিকের উদ্যোক্তা বিমল কর অবশ্যই নন্দীকে তাঁর নতুন রীতির শ্রেণিভুক্ত করে নিয়েছিলেন গত শতকের পঞ্চাশের দশকে।

১১.৩ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও অন্যান্য সাহিত্যসৃজন

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কয়েকটি গল্প নিয়ে আলোচনা করলে দেখব, জীবনকে তিনি কতটা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। মনস্ব জটিল জীবনের গল্প বারবার তার কলমে ধরা দিয়েছে। হয়তো জীবনকে এভাবেই দেখেছেন, যেভাবে জগৎ এবং জগতের যাবতীয় উপাদানকে উপলব্ধি করেছেন।শিল্পবোধ মানুষের রুচিকে অনেকখানি সমৃদ্ধ করে। একজন শিল্পীই জানে, তা শিল্পচাহিদা, অর্থনৈতিক অবস্থান মানুষকে কখনো ওপরে, কখনো নিচে নামিয়ে দেয়। 'খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর' গল্পটিতে জ্যোতিরিন্দ্র একজন অভাবগ্রস্ত চিত্রকর উমেশের আর্থিক চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে বাণিজ্যিক ছবির একটা অবস্থান তুলে ধরেছেন। ধনিকশ্রেণির শিল্পবোধের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। উমেশের ভেতর মানুষের যে-রূপ তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যক্ষ করে পাঠক বিমোহিত না হয়ে পারে না। গল্পের তথাকথিত আঙ্গিক ভেঙে জ্যোতিরিন্দ্র সত্যি সত্যি জনতার যাবতীয় উত্তেজনার উৎসের সন্ধান জেনে গেছেন বলেই স্বতন্ত্র প্রেক্ষাপট রচনা করেছেন। উমেশ বাঁচার সঞ্জীবনীমন্ত্র পেয়ে যাওয়ার কারণ মানুষের মধ্যে তার শিল্পের কদর বেড়েছে। হয়তো এভাবেই মানুষ শিল্পের কাছে অর্থাৎ শিল্পীকে ভালোবেসে তাঁর শিল্পকে মূল্যায়িত করে, শিল্পকে ভালোবেসে পূর্ণতা অর্জন করে, জটিল মনস্তত্ত্বের এ-গল্পে নতুন দিনের যে সকাল উদিত হতে দেখা যায়, তা হয়তো কেবলই জীবন-জগতের বৃহৎ পরিমন্ডল থেকে নেওয়া রূপের বিন্যাস। 'সামনে চামেলি' গল্পে প্রতিবন্ধী এক সাতাশ বছরে পা রেখেছে এমন যুবকের কাহিনি ফুটে উঠেছে। হোমিওপ্যাথির ডাক্তার বাপের বড় ছেলে, যে কি-না লেখাপড়া শিখে একদিন মানুষ হবে, জগৎ-

সংসারে সেবা করবে, মানুষজন ধন্য ধন্য করবে; কিন্তু তা হয়নি। রাস্তায় গাড়িচাপা পড়ে একটা পা হারায়। সেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে যুবক রাস্তাটাকে দেখে আর রাস্তার মধ্যে জীবনের সূত্রভেদ খোঁজে, যদিও তার একটা চাকরি আছে প্রাইমারি স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে পড়ানোর। চাকরিটাও জুটিয়ে দেয় বন্ধুর বাবা প্রভাবশালী মানুষ হওয়ার দরুন। একশ কুড়ি টাকার সঙ্গে আরো দুটো টিউশনি, তাতেই বুড়ো বাবা-মা ও তিন ভাইবোনকে নিয়ে সংসার। এছাড়া আর কোনো স্বপ্ন নেই, স্বপ্ন থাকতেও নেই। যদিও কলেজে ঢোকার আগের বছর কবিতা লিখেছিল, সাত-আটটা কবিতা লেখে; কিন্তু সেগুলো কোথাও ছাপতে দেয়নি, হয়তো জীবনটা কবিতার মতো ছন্দময় হয়নি। আজ তার আশা নেই, ভালোবাসা নেই, সব হারিয়ে গেছে শুধুই করুণাপ্রার্থী সে। গায়ের জামা-কাপড় পুরনো মলিন। গরিবি চেহারার মানুষ। রোগগ্রস্ত-অপুষ্টি এবং স্বপ্ন-আশাহীন সাতাশ বছরের এক যুবকের জীবনাচরণ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তুলে এনেছেন। শহর জীবনের ঘিঞ্জি বসতির চিত্ররূপ যেভাবে এঁকেছেন এবং ক্র্যাচে ভর দেওয়া যুবকের মনের অতৃপ্তির কথা বয়ান করেছেন, তাতে মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্তের ছবিটাকে পাঠক প্রত্যক্ষ করে। হতাশার ভেতর দিয়ে গল্পটি সমাপ্ত হলেও ভিখিরি ভেবে কোনো এক দিদিমণি পয়সা ছুড়ে দিলে সে যেন নির্লজ্জ বেহায়া, হেসে মাথা নাড়ল। বুকের ভেতরের অনেক কথাকে হাসির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করল যুবক, হয়তো এখানেই লেখকের সার্থকতা 'সামনে চামেলির' গল্পে। মধ্যবিত্তের টানাপড়েনের একটা চিত্র জলছবির মতো উঠে এসেছে এখানে।শেষাবধি দেখা গেল, এক বৃষ্টির রাত্রে জলে-কাদায় লুটোপুটি খাচ্ছে মাধবিলতা গাছটা। ডুমুরের ডালের বেড়াটা ভেঙে তছনছ হয়ে আছে আর সাধের সেই পেঁপেগাছের চারাটি নেই। গল্পের মধ্যে একটা চুরির গন্ধ থাকলেও সেটা চুরি নয়, সুকুমারদের বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে যেদিন মদন চলে এলো এবং পিন্টুদের বাড়িতে কাজ পেল, আশ্রয় পেল, ঠিক সেদিন থেকেই সুকুমার এবং তাদের বাড়ির প্রতি একধরনের ঈষৎ মদনের ছিল। সে যতই পিন্টুকে বা ওর বাবা-মাকে আপন করুক না কেন, আসলে মনেপ্রাণে সে চাইছিল আবার ওই বাড়িতে কাজ পেতে। জ্যোতিরিন্দ্র যে কিশোর চরিত্র নিয়ে মনস্তত্ত্বমূলক গল্প লিখেছেন, 'চোর' গল্পটি অবশ্যই তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ গল্পের দাবিদার। মানুষের মধ্যে যে দুটো রূপ থাকে –

ভালো এবং মন্দ – যা সবসময় হয়তো দেখা নাও যেতে পারে, তার পরও মানুষের ভেতরের হিংস্রভাবটা কদাচিৎ ফুটে বের হয়ে আসে। কিশোর মদনের ভেতরের ভয়ংকর সাপ একদিন সত্যি সত্যি বের হয়। তখন সে আর মানুষের খোলসে থাকে না। একটা কালসাপে পরিণত হয়। তবে সত্য হলো বিলাসবসন ছেড়ে কে দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হতে চায়। কারণ সুকুমাররা ধনী, পিন্টুরা গরিব। গল্পে ধনী-গরিবের ব্যবধান মুখ্য হয়ে চিত্রায়িত হয়েছে। তেমনভাবে বোঝা না গেলেও একটা ইঙ্গিত তো আছেই। একটা সময় দেখা যায়, সুকুমার আগের চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েছে পিন্টুর। তখন পিন্টুও ওই বাড়িতে পড়ে থাকে। ভালো লাগে হয়তো। তখন মনে হয় পেঁপেগাছটা মদন চুরি করেনি, পিন্টুই চুরি করেছে ওই পেঁপেগাছটা। বৃত্ত ভাঙার যে-আকাঙ্ক্ষা মানুষের আজন্মকাল, সে-প্রচেষ্টা সফল হয়েছে এ-গল্পে পিন্টুর চুরি যাওয়া পেঁপেগাছের সঙ্গে। এমন নগণ্য একটা বিষয়কে গল্পের ছাদে সাজানো যে, সে সাহিত্যিকের কর্ম নয়। জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পের শরীরে ভেতরের মানুষের যে লালিত স্বপ্ন এবং তার ভেতর দিয়ে একটা বোধ, তা স্পষ্ট লক্ষ করা যায়, 'রাইচরণের বাবরি' গল্পে। বিষয়বস্তু তেমন কোনো মুখ্য নয়, একটা উপলব্ধি আদ্যোপান্ত ধরা পড়ে। রাইচরণের দৃষ্টিনন্দন কেশবিন্যাস গল্পের প্রধান বিষয়াবলি। অকৃত্রিম তার এই কেশ নিয়ে সে সর্বদা গর্বিত। একশ পঁচিশ টাকার থিয়েটারে অভিনেতা হিসেবে কাজের চেয়ে বাবরির মর্যাদা তার ঢের বেশি থাকুক, অভাব-অভিযোগ, খলিফার দোকান থেকে জীবন চলছে চলুক, তার পরও নিজের খানদানি বাবরির মর্যাদা কোনোক্রমে ধূলিসাৎ করতে চায় না। প্রতিভা যেমন বিধাতাপ্রদত্ত, সখ বা নেশাও রুচির ওপর নির্ভরশীল, কেউ কখনো তার বোধকে বিকিয়ে সফলকাম হয় না, রাইচরণ পারেনি আপস করতে নিজের সঙ্গে। আসলকে আসল এবং নকলকে নকল বলতেই চেয়েছে। এর বাইরে সে শুধু একমাত্র ছাপোষা মানুষ।তারিণী শেষাবধি মারা গেল। ঠেলাগাড়ি তার ওপর দিয়েই গেছে বলে লোকে বলাবলি করে। নিম্নমধ্যবিত্ত শহরজীবনের 'তারিণীর বাড়ি বদল' গল্পে এক পিতাকে দেখা যায়, যিনি সামান্য বেতনের প্রেসের চাকুরে, দশ-দশটা ছেলে-মেয়ে-স্ত্রী নিয়ে যার বিশাল সংসার, এমন একটা সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তারিণী। কলকাতা শহরের প্রায় অভিজাত এলাকায় বসবাস করে আসছেন দীর্ঘদিন ধরে; কিন্তু একদিন

বাড়ি বদল করে বেলেঘাটার দিকে অল্প পয়সার ভাড়ায় যেতে চাইলেন। খবর শুনে তার কাছে পাওনাদাররা ছুটে আসে এবং তারা সবাই নগদ অর্থ দাবি করল; কিন্তু সে তাদের ঠিকানা দেয় এবং বলে, সময়মতো বাকি টাকা পরিশোধ করে দেবে। অথচ এককড়ি মুদি-কয়লার দোকানের রামশরণ-গয়লানি কমলাদের ওই এক কথা পাওনা টাকা না নিয়ে এক পা-ও নড়তে দেবো না, ঠেলাওয়ালাকে ধমকে দূরে দাঁড় করায়। সেক্ষেত্রে তারিণীও এককাঠি ওপরে। সে যাবেই, যেভাবে পারে। অবশেষে দেখা যায়, ঠেলাগাড়ি নিজেই ঠেলে নিয়ে যায়। কিছু রাস্তার ছেলে-মেয়ে-স্ত্রী ঠেলেছিল। একে-একে সবাইকে ঠেলায় উঠিয়ে নেয়। নিজেই তখন ঠেলা ঠেলে যেতে গিয়েই এই অনাসৃষ্টি কান্ড বাধায়। এ-গল্পে মধ্যবিত্তের কষ্ট এবং যন্ত্রণার ছবি পরিষ্কার উঠে এসেছে। মানুষ কতখানি অসহায় দারিদ্র্যের কাছে। আর্থিক অসঙ্গতি একজন মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়। মানসম্মান খুইয়ে মানুষ এভাবে বাঁচতে চায় না। তাই হয়তো সমস্ত বোঝা একাই নিজের কাঁধে নিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে, বেলেঘাটার দিকে যেতেই তার জীবনে সত্যিই কী ঘটল তার ইতিহাস কেউ হয়তো আর নেয়নি, নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। এভাবে একটা শহরকেন্দ্রিক নিম্নবিত্তের সমস্যাকে গল্পের আঙ্গিকে ফেলে পাঠকের সামনে তুলে এনেছেন এবং হয়তো সে-কারণে তিনি সার্থক একজন সাহিত্যিক। হোক গ্রামীণ অথবা নাগরিক প্রতি গল্পের বাঁকে বাঁকে জ্যোতিরিন্দ্র তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন মানুষকে, মানুষের ভেতরের আরেক মানুষকে। মনস্তাত্ত্বিক গল্প লেখার ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্রের জুড়ি মেলা ভার। তিনি গল্পের ভাঁজে ভাঁজে যে জীবনের সন্ধান দেন, তা প্রকৃতঅর্থে জীবনের গভীর চোরাবালি থেকে সংগ্রহ করা। জীবন ও জগতের মাঝখানে যে মানুষ, তাকেই তিনি সন্ধান করে চলেন গল্পের আখ্যানভাগে। 'নদী ও নারী' এমনই একটি মনস্তাত্ত্বিক গল্প, জীবনআখ্যান। গল্পের দৃশ্যপটে দেখা যায়, সুরপতি-নির্মলা নৌকাযোগে পদ্মায় হাওয়া খেতে বের হয়। সেখানে আরেক দম্পতির আগমন টের পান এবং সেই আধুনিকা রমণীর রণরঙ্গিণী রূপ যেমন তাকে পরিচিত করে তোলে, তেমনি আবার গানের সুরের মাধুরীতে ভরে ওঠে রাত্রের নিমগ্নতা। একসময় তথ্যতল্লাশ করে জানা যায়, আধুনিকা রমণীর বাইরের খোলস আসলে একটা আবরণ, মূলত মেয়েটি সতী-সাধ্বী নারী, যে একজন বিকলাঙ্গ

ও যক্ষ্মারোগগ্রস্ত এবং অন্ধ স্বামীকে নিয়ে ডাক্তারের নির্দেশে প্রায় তিন বছর ধরে নদীবক্ষে ভেসে বেড়াচ্ছে বেঁচে থাকার মন্ত্র জোগাতে। গল্পটির মধ্যে মানুষের ভেতরের চিত্রটি তুলে ধরার যে-প্রয়াস তা বেশ সুস্পষ্ট অনুধাবন করা যায়। মানুষকে চেনা বা তার ভেতরের মানুষটিকে বোঝাই মূলত গল্পের বিষয়বস্তু, কোনো ঘনঘটা ছাড়াই গল্পটি একটা পরিণতির জায়গায় পৌঁছে গেছে। আরেকটি মনস্তাত্ত্বিক গল্প 'চন্দ্রমল্লিকা' উত্তমপুরুষে লেখা। বন্ধুপত্নী বিনতাকে, যার স্বামী রোড অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে, তার জন্য সমবেদনা জানাতে বর্ষা পার করে শরতের এক সোনাঝরা দিনে আগমনের গল্প। অপরেশ মরে গেছে তাই রমেশকে চাকরিটা দেওয়া হয়েছে। কারণ অপরেশের অবর্তমানে আরেকজনের চাকরি না করলে যে সংসারটা চলত না। পুত্রশোকে মা কাশীবাসী হয়েছেন; কিন্তু বিনতার কোথাও যাওয়া হয়নি। সে একটা চন্দ্রমল্লিকা হয়ে থেকে গেছে এবং থাকবে। জীবনটা হয়তো এমনই। নয়টায় ফোটে আর বারোটাই শেষ। এত স্বল্প আয়ু নিয়ে বাঁচতে হয় যাদের, তাদের আনন্দও ওই সীমিত। তার পরও কথা থেকে যায়। যতক্ষণ বাঁচল, সুন্দর হয়ে বাঁচার মধ্যেই সুখ। একটা মানুষকে সমবেদনা জানাতে এসে তার স্মৃতির ভেতর হারিয়ে নিজেকে চরমভাবে খুঁজে ফেরা এবং সেখান থেকে নিজেকে আবিষ্কার করা। সত্যিই জীবন বড় বিচিত্র, মানুষ এবং জগৎ কখনো সময়ের কাছে বাধা হয়ে যায়। কখনো মনে হয়েছে, জ্যোতিরিন্দ্র কেনো প্রেমের চেয়েও অপ্রেমের গল্প বেশি বেশি লিখতে গেলেন। তার জীবনটাই কি প্রেমহীনতায় ঠাঁসা? কখনো হিংস্র-জটিল-কুটিল অথবা আপন অস্তিত্বে বিভোর একজন মানুষ সমগ্র সৃষ্টির কাছে পরাজিত হয়। 'গিরগিটি' গল্পে সেই মানুষটাকে প্রত্যক্ষ করি আমরা, যার চোখে মায়াকে একটা চিতাবাঘিনী রূপে বিন্যাস করা হয়েছে। সত্যিকার মনস্তাত্ত্বিক একটা গল্প 'গিরগিটি' 'প্যাঁকাটির মতো সরু জিরজিরে হাত-পা, শুকনো খটখটে ক'খানা পাঁজর, শনের মতো পাকা একমাথা লম্বা রুক্ষ চুল ও হলদে ফ্যাকাশে চোখ-জোড়া নিয়ে কালেভদ্রে যদি কখনো লোকটা তার সামনে এসে দাঁড়ায় কী পাশ কেটে চলে যায়, মায়ার মনেই হয় না একটা মানুষ, একজন পুরুষ, ঠিক বুড়ো হয়েছে বলে নয়, ওর ক্ষীণ হাত-পা, নিষ্প্রাণ চাউনি, মন্থর চলার মধ্যে এমন একটা কিছু মিশে আছে যে, মায়ার কখনো কখনো ওকে দেখলে ডুমুরতলার ওধারের পুরনো ভাঙা

পাঁচিলটা কি পেঁপে-জঙ্গলের পাশের মৃত নিষ্প্রাণ সহস্রক্ষতচিহ্নযুক্ত মাদার গাছটার চেহারা মনে পড়ে।' মায়া বরাবরই প্রতিবেশী বুড়ো ভুবন সরকারকে এভাবেই দেখে এসেছে, একটা মানুষ কতটা অসহায়-অথর্ব হতে পারে, তা মায়া প্রত্যক্ষ করে এবং মনজুড়ে করুণা উথলে ওঠে। মায়ার দুবছরের ছোট্ট সংসার। ওর স্বামী প্রণব নয়টা-পাঁচটা চাকরি করে। প্রণবের সঙ্গে মায়ার শারীরিক সম্পর্ক, প্রণবের মুখে রাতদিন তার রূপযৌবনের অঢেল লাবণ্যের প্রশংসা শুনতে মায়ার বিরক্ত লাগে এবং সে-কারণে প্রণব ক্রমশ তার কাছে একঘেয়ে বিবর্ণ-ক্লান্তিময় হয়ে ওঠে। পাশাপাশি বুড়ো ভুবন সরকারকে ভালো লাগে, কারণ সে মায়ার পছন্দের জিনিস বা রুচি বুঝে কথা বলে, যার জন্য মায়া ওকে একটু একটু ভালোবেসে ফেলে, অথচ ক্রমে ভুবনের ভেতরের রঙটা বেরিয়ে আসে, গিরগিটি যেমন তার রং বদলায়। যখন বুড়ো ভুবন জানায়, উল্টাডাঙার শশী বায়না, বিধবা ভাগ্নির মেয়ে, সোমত্থ মেয়ে... মায়া হাসি থামিয়ে বলল, বলেন কি এই বয়সে আবার! শশীকে বলে দিন, এই বয়সে আর ওসব হয় না... পরক্ষণে ভুবন জানাল, পিপাসা যে মেটে না, পিপাসার যে নিবৃত্তি নেই। মায়া অকস্মাৎ পাথরের মতো স্থির শক্ত হয়ে যায়। নিজেই যেন নিজের মধ্যে শামুকের মতো সেঁধিয়ে যায়। মায়া ভয়ে অাঁতকে উঠলেও হঠাৎ তার কান্না পায় এবং পরমুহূর্তে যুবক স্বামীর কথা ভুলে যায়। কোমল হাতটা মরা শুকনো কাঠের গায়ে তুলে দিয়ে অবলীলাক্রমে মায়া হেসে বলল, বিশ্বাস করি, তা না হলে কি আর দুপুররাত্রে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এই আয়নার সামনে দাঁড়াই – জ্যোতিরিন্দ্র মনস্তাত্ত্বিক গল্প লেখার ক্ষেত্রে এক বিরল প্রতিভা। তিনি উঠতি বয়সী টিনএজদের নিয়েও অনেক গল্পের আঙ্গিক নির্মাণ করেছেন। 'নীল পেয়ালা' গল্পটি কৈশোর-উত্তীর্ণ একটা ডকুমেন্টারি লেখা। বৈদ্যনাথ এখানে একজন দর্শক বললেই হয়, যে পৃথিবীর তাবৎ তরুণদের সমস্যা চাক্ষুষ করছে। তিপ্পান্ন বছরের একজন মানুষ, যার জীবিকার্জনের উপায় এ-জি অফিসের একটা চাকরি, দশটা-পাঁচটা ছকে বাঁধা জীবন, তার সঙ্গে পরিচয় বিবেকানন্দ রোডে মামাবাড়ি বেড়াতে আসা একটা তরুণের, বিলাসবাসনে থাকা বাবা-মা কানপুরে থাকে, গাড়ি-বাড়ি সবই আছে। ছেলেটি স্কুল ফাইনাল দেবে। বছরে দু-একবার কলকাতা বেড়াতে আসে। ভালো লাগে আবার লাগেও না; কিন্তু ছেলেটি আত্মহত্যা

করতে চায়। জীবনে অনেক কিছু দেখেছে আবার দেখেনি অথচ এরই মধ্যে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে, হাতে অঢেল অর্থকড়ি, ভালোবাসা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ হয়তো তার কোনো কিছুতেই কমতি নেই। তার পরও মরতে চায় তার মন, এমন একটা জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারে না বৈদ্যনাথ; কিন্তু পার্কে বেড়াতে আসা একটা সুন্দর গায়ের রঙের মেয়ের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বৈদ্যনাথ যখন জানায়, জীবন বাস্তবিক সুন্দর, ওই মেয়েটির মতোই, এমন সময় ছেলেটি দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে এবং বলে, আপনি আরেকবার আমার মৃত্যুর পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন। দ্বিতীয়বার মরতে তৈরি হতে বলছেন...। এখানেই বোঝা যায় যে, কঠিন কোনো ব্যামো নয়, প্রকৃতঅর্থে ছেলেটি আপনজনের সান্নিধ্য বঞ্চিত নিরাশায় নিমজ্জিত, ব্যর্থতা-নিসঙ্গতা তাকে কুরে কুরে নিঃশেষ করছে। গল্পটি তরুণ সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী একটি উল্লেখযোগ্য রচনা, অনেক চাওয়া-পাওয়ার পরও আরো অনেক বাকি রয়ে যায়, যার ছবি 'নীল পেয়ালা'য় ফুটে উঠেছে সুস্পষ্ট। এখানেই জ্যোতি অনবদ্য। আলোর অনেক বিচিত্র অনুভূতি দিয়ে জীবনের চলমান নৌকাটিকে কখনো কূলে নয়তো গভীর সমুদ্রে নিয়ে যেতে পারেন। বিষয়ের পাশাপাশি গল্পের প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যকে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই তো প্রতীক-প্রয়োগে নিরাসক্তি, সূক্ষ্ম কবিত্বময়তা সৃষ্টি এবং গভীর অভিজ্ঞতাকে তিনি সমন্বিত করেছেন, সাহিত্য সৃজনে মানুষের অস্তিত্বের শিরায়-উপশিরায় গাছের গভীর সঞ্চারকে রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারে উদ্বোধিত করেছিলেন, তাই আমরা জ্যোতিকে সার্থক একজন উত্তরাধিকার হিসেবে শনাক্ত করতে পারি।

১১.৪ অনুশীলনী

১) জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জীবন ও সাহিত্যসৃজনের মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিলো আলোচনা কর।

২) সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে ছোটগল্প ও উপন্যাসের প্রেক্ষাপট আলোচনা কর।

৩) জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সমকালীন সাহিত্যক্ষেত্রের প্রেক্ষাপট আলোচনা তার ব্যক্তিক্রম কোথায় বর্ণনা কর।

১১.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১) সমাজ আলেখ্যঃ বারো ঘর এক উঠোন – রানু বিশ্বাস, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

২) বাংলা সাহিত্য পরিচয়, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তুলসী প্রকাশন।

৩) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দেবেশ কুমার আচার্য, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি।

একক - ১২ বারো ঘর এক উঠোন

বিন্যাস ক্রম

১২.১ বারো ঘর এক উঠোন

১২.২ দেশ কাল ও সমাজ

১২.৩ অপ্রধান চরিত্র ও উপকাহিনির সংযুক্তিকরণ

১২.৪ অনুশীলনী

১২.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১২.১ বারো ঘর এক উঠোন - দেশ কাল ও সমাজ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুই হলে মধ্যপ্রাচ্যে ও দক্ষিণে পূর্ব এশিয়ায় বিট্রিশ সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষার দিক থেকে ভারতবর্ষ গুরুতবপূর্ণ অবস্থানে পরিণত হয়। কাজেই সে সময় ভারতীয়দের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা বিট্রিশদের পক্ষে আবশ্যিক হয়ে পড়ে। ১৯৪০ এর দশকে ভারতবর্শ শাসন করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল বলেই বিট্রিশরা ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ভারতের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল – মুসলিম লিগ ও কংগ্রেসকে নিয়েই সমস্যা তৈরি হয়েছিল বেশি। লিগ ভারতীয় মুসলিমদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী দল বলে দাবি করে, তাদের ১৯২৯ সালের পেশ করা চোদ্দ দফা দাবিতে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব এবং বাংলা সহ মুসলমান প্রধান অঞ্চল গুলির জন্য প্রকারন্তরে পৃথক রাজনৈতিক স্বীকৃতি চাওয়া হয়েছিল এবং ১৯৩০ সালে মহম্মদ ইকবাল পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের কথা বলেন।

মহম্মদ আলি জিন্না হিন্দু ও মুসলমান কে নিয়ে দ্বিজাতি তত্ত্বের কথা জোড়ের সঙ্গে প্রচার করেন 'টাইম এন্ড টাউড' পত্রিকায় ১৯৪০ সালে ১৯ জানুয়ারি আলি জিন্না লেখেন –

"In India there two Nations, who both must share the governance of the common motherland. "(লাডলিমোহন রায়চৌধুরীঃ সমগ্র গ্রন্থ পৃঃ ১৩-১৬)

কিন্তু এই তত্ত্ব শুধু মুখরোচকই থেকে যায়, ১৯৪০ সালে ২৩ শে মার্চ লিগ লাহোর অধিবেশনে মুসলমান প্রধান অঞ্চল গুলি নিয়ে পৃথক স্বাধীন রাজ্য গঠনের প্রস্তাব দেয় লিগ। কিন্তু এই প্রস্তাব সরকার কোন ভালো চোখে দেখে নি। ইংরেজদের শাসনে অসুবিধা হতে পারে দেখে ১৯৪৬ সালে ১৫ ই মার্চ এটলি আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করেন – 'We are very maidful of the right of minorities and minorities should be able to live free from fear. On the other hands We can not allow a minority to place a veto on the advance of the majority.'অর্থাৎ সংখ্যালঘু তথা মুসলিম লিগ ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন বাঁধা সৃষ্টি সাংবিধানিক অচলাবস্থা সৃষ্টি করলে সরকার তা মেনে নেবে না।

ভারতীয় রাজনৈতিক পরিধিতে রাজনৈতিক দলগুলিতে এক সারিতে নিয়ে এসে কত দ্রুত স্থায়ত্ব শাসন সম্ভব তার জন্য ক্যাবিনেট মিশন গঠিত হয়। ২৩ শে মার্চ ক্যবিনেটের তিনজন সদস্য স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস, ভারতসচিব প্যথিক লরেন্স, এবং এ ভি আলেকজান্ডের ভারতে আসেন। এরা মোট ৭৪২ জন ভারতীয় রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে ১৮২ টা বৈঠক করেন। কিন্তু এত কিছুর পরেও এই দুই দলের কোন ঐক্য দেখা যায় নি। ফলে ১৯৪৬ সালে ১৬ই মে ক্যাবিনেট মিশন গঠন করা হয়। ১৬ই জুন প্রথমে মুসলিম লিগ এবং ২৫ শে জুন কংগ্রেস এই প্রস্তাবে সম্মতি জানায়। কিন্তু এই প্রস্তাবও ব্যর্থ হয়। উভয় পক্ষের অনমনীয় মনোভাবে বিরক্ত হয়ে ক্যাবিনেট মিশন শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। কিন্তু ১৯৪৬ সালে ১৬ ই আগষ্ট পাকিস্তানের দাবি কর Direct Action কথা ঘোষোণা হয়, যার ফলস্বরূপ নোয়াখালি, বিহার, পাঞ্জাবে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হয়।

ভারতবর্ষ এই অবস্থা দেখেই বিট্রিশরা বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবেন, ১৯৪৭ সালে ২রা জুন সর্বদলীয় বৈঠক মাউন্ট ব্যাটেন দেশভাগের কথা জানান। ৩রা জুন বিট্রিশ প্রধানমন্ত্রী এটলি হাউস অফ কমেন্স ভারত ভাগের কথা ঘোষণা করে বলেন,

'ভারতকে অখন্ড রাখার জন্য ক্যাবিনেট মিশন যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, ভারতের নেতারা যেহেতু তা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, দেশভাগ তাই হয়ে দাঁড়ালো অনিবার্য বিকল্প'(সন্দীপ বন্দ্যোপাধায়াঃ দেশভাগ)

ফলে হত্যা, রক্তপাত, নারী হরণ আর নির্যাতনের হাত ধরে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবাসী লাভ করে এক খন্ডিত স্বাধীনতা। সীমানা কমিশনের ফলে ক্ষত বিক্ষত দেশের অগণিত নরনারী দেশের এপারে ওপারে চলে যান। জীবিকা ভিটে মাটি ত্যাগকরেন অনেক। উদবাস্তু সংখ্যা এক সময়ে বেড়েই চলে। ১৯৪৮ সালে ক্যম্পে উদ্‌বাস্তু হয় ৭০ হাজার। ১৯৬০ ৬১ সালে উদ্‌বাস্তু আগমনে তৃতীয় পর্যায় চলে- সেই সময় টা জ্যোতিরিন্দ্রের উপন্যাসের প্রেক্ষাপট।

এই কালপর্বের ১৯৩৯-১৯৪৭ সময়ের গতি দ্রুত, পরিবেশ অস্থির ও নিয়ত পরিবর্তিত, চারদিকে ধ্বংস আর অবক্ষয়ের পাশাপাশি সংগ্রামের শপথ আর নবজীবনের স্বপ্ন বাণি উচ্চারিত। বারুদের গন্ধ ফ্যানের গন্ধ, মরার গন্ধ, রক্তের গন্ধ – যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ – দাঙ্গা – এরই মধ্যে পা ফেলে এগিয়ে চলেছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বসমকালিন লেখক গোষ্ঠীরা।

'সে সব দিনের কথা ভোলা যায় না। তখন কার জীবন্ত গল্পের মতো ছিল না। দিনে দিনে তখন দিন বদলাচ্ছে, নাটক ঘটে যায় দেশের বুকে, সমাজে, মানুষের মনের মধ্যে খবরের কাগজ তখন বড় বড় হরফে যুদ্ধের খবর, বোমা, ইভাকুয়েসন, বিয়াল্লিশের বিপ্লব, মন্বন্তর একটার পর একটা সারা কলকাতার বুকে মার্কিন সৈনিকের বঙ্কিম উল্লাস বিট্রিশ টার্মদের হটকারিতা। কিন্তু আমাদের মনের ওপর যা কিছু ছাপ রেখে যায় তা মনের ভিতরটাকে আন্দোলিত করে স্থির হয়ে ডুবে যায় মনের গভীরে। কারণ মন তখন মগ্ন হয়ে আছে সসাহিত্যের শান্ত দিঘিটিতে।'(ঋষিদস্যু এক কিশোর বালকঃ দেশ সাহিত্য ১৩৮২)

সেদিনকার সেই অস্থির সময়ে যারা লিখতে এসেছিলেন তাদেরই অন্যতম জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। "সমাজ সম্বন্ধে বা সামাজিক বাস্তবতা সম্বন্ধে কোনো মোটা তথ্য পুস্তকের ভাষায় বলতে গেলে Fross Dimensions of social এদেশে তখন হাজির করা যায় নি, কারণ, বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথে বটেই তারশঙ্কর বনফুলেরও জগত শৃংখলা ধারণা বিশ্বতত্ত্ব মূল্যের তারতম্য বোধ মহাযুদ্ধের দাপটে ভঙ্গপক্ষ হয়ে মাটিতে লুটোচ্ছিল। নাগরিক বাঙালী মধ্যবিত্ত পারিবারিক জীবনে যা কিছু মাধুরী তার শেষ আলো ছড়িয়ে গেল বুদ্ধদেব বসুর 'তিথিভোর'-এ (সেপ্টেম্বর ১৯৪৯) এর পরেই এল দ্বিপ্রহরে অন্ধকার, মীরার দুপুর -১৯৫৩ তার সাক্ষ্য। মীরার স্বামীর আত্মহত্যা এবং মীরার নৈতিক বিশূণ্যতার পথে পা বাড়ানোর তাই কোনো ট্রাজিক মহিমা নেই। এমন কি কারোর জন্য সহানুভূতির কোনো অশ্রুবিন্দু জমে উঠুক এ অভিপ্রায়ও এ উপন্যাসে নেই। শুধু অনিবার্য হয়ে ওঠে এই পর্যবেক্ষণ যে নিঃসঙ্গ দুপুরও মীরা ও কত একাকী। আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশি সবাই এদের কাছে নির্থক (বারো ঘর এক উঠোন – এ ও ১৯৫৫ এই ব্যক্তি গুলির এই নিসহায় একাকীত্ব প্রধান কথা। তাদের নিন্মবর্বতরা কত অপ্রতিরোধ্য সেকথায় সেখানে মুখ্য। (সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার ধারা, পরিচয় শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৮৮।)

সেই সময়ের শ্বাসরোধী বাস্তবতার নিখুঁত প্রতিবেদন সমরেশ বসুর বিরর (১৯৬৫)। এই বাস্তনবতার আর এক চেহারা ইতিহাসের নতুন ব্যাখ্যা মহাশ্বেতার 'আঁধার মানিক'(১৯৬৭), মহাশ্বেতা দেবী বিমল কর, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় শেষ পর্বের উপন্যাস, রমাপদ চৌধুরী শেষ পর্বের উপন্যাস তৎকালীন অবক্ষয়ের নির্মোহ আলেখ্য। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী কলকাতায় আসেন ১৯৩৬ সালে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নানা ধরনের কষ্টকর চাকরি করেছেন, বস্তিতে বাস করেছেন, জীবনকে দেখেছেন নংন কঠোর বাস্তব প্রেক্ষিতে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সর্বার্থে নাগরিক লেখক। লেখক হিসাবে অন্তর্মুখী তিনটি পর্বে – ১ম পর্বে নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয় ২য় – শরীরের অমোঘ সীমাবদ্ধতা থেকে শরীর উত্তর এক আকর্ষণে কত ওপরে উঠিয়ে নেয়, ৩য় পর্বে ভালোবাসা স্বার্থত্যাগ, আত্মত্যাগ মানুষকে কত উপরে উঠিয়ে নেয় বার করে আনে এক মানুষকে, যে সৌন্দর্য, সত্য ও নির্লোভতার উপাসক।

তিরিশ চল্লিশের বাঙালী মধ্যবিত্ত ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি চেয়েছিল এই মুক্তি অভীপ্সা জতখানি না জাতিয়াতাবোধ সঞ্জাত ততখানি শ্রেণি স্বার্থ প্রণোদিত এই শ্রেণী স্বার্থের প্রেরণাতেই ইনিশ শতকের বাঙালী মধ্যবর্গ ঔপনিবেশিক শাসনকে জাতিয় জীবনের আশির্বাদ বলেই গণ্য করেছিলেন। কিন্তু দেশ বিভাজনের ফলে পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তরপূর্ব ভারতের উদবাস্তু সমস্যা অভাবনীয় প্রবলতার গোলমাল পাকিয়ে দিয়েছিল, পঞ্চাশের আকাল এবং বিশ্বযুদ্ধের টালমাটাল পর্বের রেশ ও সহজেও কাটবার ছিল না। তেলেঙ্গা কাকদ্বীপ তেভাগা যেমন ব্যর্থ হয়েছে তেমনি ব্যাংক গুলি হয়ে পড়েছে দেউলিয়া। আর ভূসম্পদ অর্থনৈতিক পরিভাষায় কমন রিসোর্স এর ওপপ্র পরে উদবাস্তুর চাপ। চাকরি বাকরি ব্যবসা সব কিছু ব্যহত হয় পূর্ব বঙ্গের গ্রামের ভিটে মাটি দেশান্তরে চলে যাওয়া কলক্তাতার মধ্যবিত্ত বর্গের একাংশের আর্থিক সুস্থিতি ধারাবাহিকতা ব্যহত হল। যে মধ্যবর্গ ঔপনিবেশিক পর্বের প্রান্তিক মানুষের গণবিদ্রোহ, মুন্ডা সাঁওতাল, সিপাহী বিদ্রোহ ছিল নীরব অবজ্ঞার বিষয়। জাতিগঠনে উদবাস্তুদের কোন ভূমিকা ছিল না। পূর্ববঙ্গ থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে যারা এসেছিলেন পশ্চিম বঙ্গে তাদের মধ্যেও ছিল শ্রেণি ভেদ মর্যাদার নানা স্তর। বাস্তুভিটে হস্তান্তর করে পদ্মা পার করে টাকা করি নিয়ে এদেশের খুব কম লোকই। থিতু হতে পেরেছিলেন। কিছু কিছু আধা সরকারি চাকরি পেয়েছিলেন কিন্তু ব্যতিক্রম বাদ দিলে এই মধ্যবিত্ত অংশ ও ছিন্নমূল মানুষের গরিষ্ঠ সংখ্যকের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। এ সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে এলিয়েশনের বা বিচ্ছিন্নতার বোধ স্বপ্নভঙ্গের হতাশা বৃহত্তর গণজীবনের সঙ্গে যুক্ত হতে না পারার অক্ষমতা ও অপ্রতিরোধ্য আত্মকেন্দিকতা এবং জীবন সম্পর্কে নিষ্ঠুর উদাসিনতা এবং আত্মরতি ৫০ ৬০ এর গড়পরতা মধ্যবিত্তের ঐতিহাসিক নিয়তি হয়ে পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে বিষ্ণু দের মন্তব্য স্মরণ যোগ্য –

“নানা লোভ ক্রুরতায় আমরা ক্ষতবিক্ষত। স্বেচ্ছাকৃত অভাবে যুদ্ধে প্রতিষেধা রোগে অনাবশ্যক মৃত্যুতে আমাদের স্বপ্নগুলিও ছত্রভঙ্গ। তাই ঐক্যতান ছত্রভঙ্গ, অন্ধকার কলকাতার উচ্চকিত রাস্তার গলিতে।”

সাহিত্যিকের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং সমাজতন্ত্র ও সোভিয়েতের পক্ষে প্রচার ১৯৩৪ এ রুশ লেখক সংঘের অধিবেশনে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতারবাদের অন্যতম প্রবক্তা জদানভ এর ফরমান একসময় গোটা বিশবে বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল। বাস্তবতা শব্দটি উচ্চারণ না করলেও জ্যোতিরিন্দ্র ওই সাক্ষাৎকারে বলতে চেয়েছেন, প্রপাগান্ডা ও প্রতিবাদ বাস্তবতাকে বিকৃত করে। বারো ঘর এক উঠোন এর প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন –

“আমি যদি প্রতিবাদ করতাম তাহলে সেটা আমার কথা হত, ওদের কথা নয়। সেটা করলে আমি নিজেকে আরোপ করতাম...”

অন্যদিকে মাকর্সবাদী ফ্রিডরিখ এলঙ্গল খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন, কোনো রাজনৈতিক পক্ষপাত উপন্যাসের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। তবে লেখক যদি বিষয়গতভাবে প্রকাশ করে, তাহলে তিনি পক্ষপাতী। তবে এলেঙ্গল যাকে পক্ষপাত বলেছেন, জ্যোতিরিন্দ্র তাকে বলেছেন পলিটিক্যাল মোটিভ। ‘বারো ঘর এক উঠোন’ লেখক স্বভাববাদীদের মতো ক্ষয় ও অবসাদকেই চিত্রাঙ্কন করবেন, দেখবেন, প্রতিবাদ কোথায়। অধঃপতন ও অবক্ষয়কে মানুষ তো কেবল মেনেই নিচ্ছেন, এই বিশ্লেষণ শুধু তিনি করেছেন। কিন্তু সমাজনিরপেক্ষ হিসেবে।

অথচ কলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের বহিরঙ্গই দেখছেন। অধঃপতন ও ক্ষয়কে মেনে নিচ্ছেন, কিন্তু এই মেনে নেওয়ার অন্তরালে রাজনৈতিক ও সামাজিক যে ক্ষোভ সৃষ্টি হচ্ছে এই অবস্থার যারা দামি তাদেরকে কোন অভিসম্পাত করেননি জ্যোতিরিন্দ্র। সেইসময় পুনর্বাসন আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, বামপন্থী কৃষক আন্দোলন মধ্যবিত্তের যে ভূমিকা ক্ষয়ের বিপরীতে সামাজিক, রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে পুনর্গঠনে বাশি বাজিয়েছিলেন, জ্যোতিরিন্দ্র সহ সমকালীন লেখকেরা সেটা শুনলেন না। জ্যোতিরিন্দ্রের কাছে ডেকাডেন্সই একমাত্র বাস্তব পাত্রপাত্রীর মনোবিশ্লেষণের নামে দেখাচ্ছেন। সকলেই পাপের জন্য অপরাধের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। আর সর্বোপরি, অপরাধ স্থলন সবই সংগঠিত মূলক যৌনলালসা ও প্রবৃত্তির উৎস থেকে ‘ডেকাডেন্স’ এর এএক একমাত্রিক চিত্র।

‘কে দেখেছে জীবনের অপচয় বেশিভার চেয়ে? কে সয়েছে এত গ্লানি রানাঘাটে, ক্যাম্পে ক্যাম্পে, পথে উড়িষ্যার তেপান্তরে, জনহীন দ্বীপান্তরে আর হাওড়ার স্টেশনে?’ (মণীন্দ্র রায়)

জ্যোতিরিন্দ্রের মত ‘শিল্পীর দায়িত্ব হচ্ছে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো, প্রতিবাদ বা স্লোগান নয়। এই দাবির সমর্থনে বারো ঘর এক উঠোন ছাড়া আর কিছু গল্পের নামকরা যেতে পারে। তিনি ডেকাডেন্স দেখিয়েছেন – সমাজের শোষণ, দুর্নীতি, অত্যাচার ও অধঃপতনকে।’ একটি যায় যা বিশ্বাস ও স্বপ্নকে ভাঙ্গে। স্বাধীনতার স্বপ্ন হয়ে উঠল দুঃস্বপ্ন তা পৌর সমাজের বিশ্বাসকে তছনছ করে দিল। এই সময় আমলাতান্ত্রিক যন্ত্র ছিল অপরিণত, ভূমি উৎপাদন ছিল মধ্যযুগীয়, আধুনিক শিল্প উতপাদনের কোন পরিকল্পনা হয়নি। উৎপাদন ও বুভুক্ষার মধ্যে কোন বারসাম্য ছিল না। অর্থনীতি বিকাশে নগরায়ণ ঘটে, আমাদের ফিউডাল সামাজিক বিধি বিন্যাস তার ভারসাম্য ছিল না। অর্থনীতি বিকাশে নগরায়ণ ঘটে, আমাদের ফিউডাল সামাজিক বিধি বিন্যাস তার প্রতিবন্ধক হয়ে পরে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ছিল অপরিস্ফুট। ফলত পারিবারিক, সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রগুলি বিধ্বস্ত হয়েছিল। মানুষ হয়ে পড়েছিল অনিকেত, এই অন্যায় অবিচার দুর্নীতি স্বাধীনতা সম্পর্কে মোহভঙ্গ – বারো ঘর এক উঠোন ধরা পরে। জীবনযুদ্ধে পরাজিত বিধুমাস্টার উপন্যাসে এই কারণে উল্লেখ করে – ‘না আমার বক্তব্য ক্রাইসিস ফ্রাস্টেশনের যোগ বিয়োগ করে সমাজ। বিজ্ঞানীরা আধুনিক সমাজের যে চিত্রই আঁকুন আমরা তো চোখের ওপর দেখছি আমাদের আধুনিক সমাজটা কি?’

১৯৮১ সালে ২৫ শে অক্টোবর কালপুরুষ পত্রিকা তরফ থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। সেখানে সম্পাদক সিদ্ধার্থ দাশগুপ্ত তাকে প্রশ্ন করেন ‘মধ্যবিত্তজীবনের আরেকটা দিক প্রতিবাদ... আপনি কি এই প্রতিবাদের কথা কখনও ভাবেন নি? – উত্তরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জানান – ‘প্রতিবাদ করা বা লড়াইয়ের মনোবৃত্তি নিয়ে যে লেখা তা আমি কোনওদিন করিনি। কারণ আমার মনে হয়েছে ওটা করতে গেলে সবসময়েই একটা আওয়াজ তুলতে হয় যেখানে এক ধরনের পলিটিক্যাল

মোটিভ কাজ করে বলে আমার মনে হয়। আমার বারো ঘর এক উঠোন উপন্যাসের কথা ভাবুন... এখানে সুযোগ ছিল প্রতিবাদের, লোকগুলোই কোনও প্রতিবাদ করে না, ওরা শুধু মেনে নেয়, চরিত্রগুলোকে নিখুঁত ও জীবন্ত করার জন্যেই প্রতিবাদের আওয়াজ তুলিনি। আমি এর আগে দুএক জায়গায় বলেছি আমি যদি প্রতিবাদ করতাম তাহলে সেটা আমার কথা হতো ওদের কথা নয়। সেটা করলে আমি নিজেকে আরোপ করতাম, সেটা মোটেই শিল্পসম্মত হতো না।' এই সমাজের এই প্রশ্নত্রাই এখানে বড়। কারণ প্রতিবাদ করার যুগ নেই। স্বয়ং বিধুমাস্টার তার মেয়েদের বলেছে – গৌরীদানের যুগ চলে গেছে, আধুনিক সমাজের আধুনিকতা সকলেই মেনে নিতে হবে।

'বারো ঘর এক উঠোন' লেখার পূর্বে পারুল নন্দী (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর স্ত্রী) জানান, বারো ঘর লেখার আগে কিছুদিনের আমাকে এমন একটি বাড়িতে বাস করতে হয়েছিল। তা বলে সেখানে ড গুপ্ত ছিলেন না। বা পাঁচুভাদুড়ী, রমেশ, বিধুমাস্টার কি রুচি শিবনাথের মতন শিক্ষিত দম্পতিকে আমি দেখিনি। কেবল একটি উঠোন ঘিরে কয়েকটা পরিবারকে দেখেছিলাম।"

উপন্যাসের পটভূমি একটি বস্তি। 'এটা ভদ্রলোকের বস্তি'- এই অভিমত পোষণ করা হল।

"হ্যাঁ এখানে সবাই মফসবলের হোক, কোলকাতা হোক যথেষ্ট শহুরে হাওয়া গাঁয়ে মেখে বিপদে পড়ে এসে টিনের ঘরে বাসা বেঁধেছে। বা-বা! কী সিনেমা দেখার, রেস্টুরেন্টে খাওয়ার। নামে বস্তি। কিন্তু কোনো ঘরের প্রগতির ঠেলা বর শহরকে হার মানিয়ে দেয়।"

এই বস্তিবাসী লোকের মধ্যে স্কুল মাস্টার, হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, ব্যাঙ্ক ম্যানেজার, শিবনাথও তার বি এ পাশ করা স্ত্রী, ফেরিওয়ালা, বনমালী ব্যবসাদার, কে গুপ্ত মার্চেন্ট কোম্পানি সাহেব। তিনি এখন বস্তিবাসী –

"বিলাতী মার্চেন্ট অফিস যখন ঠেলাদেয় আকাশে ওঠে, যখন পড়ে তখন কি ভাঙ্গে, কি যায় তার হিসেব থাকে না। কত মূল্যবান রত্ন রাস্তায় ড্রেনে ডাস্টবিনে গড়াগড়ি খাচ্ছে।"(কে গুপ্ত প্রসঙ্গে)

গ্রন্থে বাস্তবের সমাজ সিফিলিস, এবরশন, ম্যাসাজ ক্লিনিক ইত্যাদি উল্লেখ আছে। আবার তৃতীয় ব্যক্তি শিবনাথ কি সুন্দরভাবে নিরপেক্ষ, দর্শকের মত ভূমিকা তার। এই প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন-

"লেখকের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে, এই চিত্রাঙ্কনে তিনি একদিকে ভাবাতিশয্যে।"

অন্যদিকে নৈতিক ক্রোধ ও নিন্দার উগ্রতা এই দুইওই বর্জন করিয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভঙ্গিতে ও বস্তুনিষ্ঠভাবে সমাজ ইতিহাসের এই বিষাদময় অধ্যায়টি বিবৃত করিয়াছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ঘটনাই হোক বা দেশভাগ অর্থনীতি প্রভাব খুব জোরালো ছিল। এই সময় অসংখ্য লোকের চাকরী চলে যায়। 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসে আমরা দেখি, গল্পের নায়ক শিবনাথের চাকরি চলে গেছে। শুধুমাত্র স্ত্রী রুচি শিক্ষিকা বলেই সংসারটি চলছে। নাহলে রুচির অফিস চাকরীজীবি হলে, সেও ছাটাই দলের কর্মী হত। কে গুপ্ত উপন্যাসের বিবেক, মার্চেন্ট অফিসের বাবু ছিলেন সেও বেকার হয়ে পড়েছে। দশনম্বর ঘরের ভাড়াটে অমল চাকলাদারও কারখানা থেকে ছাঁটাই হয়। বস্তির আরও দুই বাসিন্দা যারা ছুটির দিন স্ত্রীদের নিয়ে কলকাতার সিনেমায় যায় তারাও একসময় বেকার হয়ে পড়ে। অর্থাৎ বেকারত্ব সেই সময়ে দেশে একতা প্রধান সমস্যা ছিল। এখানে কেউ বর্তমানের শিখিত বেকার নয়, প্রায় সকলেই ছাঁটাই কর্মী। তাছাড়া যারা পূর্ববঙ্গ থেকে এবঙ্গে এসেছিল শুধুমাত্র নিরাপত্তার খাতিরে, তারাও পূর্ববঙ্গে চাকুরীজীবী হলেও এ বঙ্গে বেকার নয় ব্যবসাজীবী। কিন্তু ব্যবসায় লোক সেইওকম উন্নতি করতে পারে না, বলাইকে আমরা দেখি ফল ছেড়ে বেগুনের ব্যবসা পরে আইসক্রিমো বেচেছে। বেকারত্বের জ্বালা বেশি দেখা যায় শহরসীমান্তে অর্থাৎ বস্তিতে। রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে উদ্বাস্তু ক্যাম্প, পশ্চিমবঙ্গ থেকে উড়িষয়া মধ্যপ্রদেশ কিংবা আন্দামান অপচয়িত জীবনের এক সুবিশাল ক্যানভাসের তুলনায় আখ্যানের সংখ্যা খুব বেশি না হলেও আখ্যানের সংকট সে অর্থে নেই। নারায়ণ সান্যালের বকুলতলা পিত্রলক্যাম্প,

বল্মীক, অরণ্যদণ্ডক, শক্তিপদ রাজগুরুর সোনা ফসলের পালা, দণ্ডক থেকে মরিচঝাকি। প্রফুল্ল রায়ের নোনাজল মিঠে মাটি – নাটকও ছোটোগল্প আখ্যানে আছে নিরাশ্রয় মানুষের ছবি, বস্তিরই নামান্তর। গভীর অনুসন্ধানী চোখ দিয়েই জ্যোতিরিন্দ্র জীবনের সক্রিয় পাঠ করেছেন। দেখেছেন ক্ষতবিক্ষত সময় পরিত্যক্ত মানুষের জীর্ণ কঙ্কালগুলোতে। যারা নাগরিক জীবনের ডাস্টবিন অর্থাৎ বস্তিতে বাস করে। বলা ভাল নির্দ্ধারিত সময় থেকে বাতিল হয়ে যাওয়া ওষূধ যেমন ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয়, কেন না তার প্রতিষেধের বদলে বিষাক্ত প্রতিক্রিয়ায় কাজ করে বলে; ঠিক তেমনি সময়ও এই বর্জ্য মানুষের গলিত দিনগুলোকে যেন বস্তিতে নিক্ষেপ করেছে। এদের নিজেদের কাছে যেমন বেঁচে থাকাটা একটা অভ্যাসের প্রক্রিয়া এরা তাই অন্যদের কাছেও বাঁচার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে অক্ষম, এই মধ্যবিত্ত বারোঘরের ছোটবড় ঘটোনা দুর্ঘটনা ভরে উঠেছে বারো ঘর এক উঠোন এর পাঁচালি।

শিবনাথ ও রুচির সাথে উপন্যাসে আমরা বেলেঘাটা কুলিয়া টেংরা বস্তিতে উঠে আসে। বারোঘরের লোকের গল্প শুরু হয় – যেমনভাবে টুয়েলভ নাইটের গল্পে দেখা গেছে তবে লেখক এখানে প্রতিটি চরিত্রই বিনুনির মত গল্পে এগিয়ে নিয়ে গেছে, একগাছিচুল অর্থাৎ আখ্যান কিন্তু পড়ে থাকেনি। কে গুপ্ত একে ভদ্রলোকের বস্তি বলেছিল। কারণ নার্স ডাক্তার শিক্ষক সমাজের উঁচুদরের কাজ করা লোকের বাস। অথচ ভেতরটা কিরকম পাকে ভর্তি – তা বস্তির জীবন থেকেই বুঝতে পারি। সমরেশ বসুর বি টি রোডের ধারে উপন্যাসটী বস্তিকেন্দ্রিক কিন্তু তার সমস্যা স্থানাভাব। ইন্তু জ্যোতিরিন্দ্রের বস্তিকেন্দ্রিক বারো ঘর স্থানাভাবের থেকে মনুষ্য অবক্ষয়জনিত বেশি। এই বস্তি কিন্তু সেইসময় কালে সমস্যাকে তুলে ধরেছে।

আমরা তো রিফুইজি মশাই বলেন – কে গুপ্ত ১৯৫০ সালে সারাবাংলা বলাভূম, সারা ভারতবর্ষে এটাই ছিল একমাত্র সমস্যা। জিন্না ও নেহেরু ভারত ভাগ দুই বাংলার মানুষের উপর পড়েছিল অপ্রিসীম চাপ। সুরক্ষিত স্থান ও ভবিষ্যতকে বাঁচানোর এই দুই দায় ছিল সারা বাংলার মানুষের। একমন ছিল মাটি থেকে শেকড় ছেঁড়া এইসব মানুষের অতীত ইতিহাস। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এদের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন –

‘অগনন মানুষ এপার থেকে চলে ওপারে চলে যায়; অসংখ্য মানুষ ওপারের ভিটেমাটি ছেড়ে আশ্রয়ের সন্ধানে এপারে চলে আসেন। নষ্ঠয় প্রায় দুলক্ষ মানুষের প্রাণ, লাঞ্ছিত হন তার চেয়েও বেশি সংখ্যক নারী। বাস্তুহারা হয়ে যান লক্ষ লক্ষ মানুষ। হত্যা রক্তপাত, নারী হরণ আর নির্যাতন এমন রক্ত কলুষময় সেই ইতিহাস যে, তার গ্লানি থেকে উক্ত হতে পারে না উত্তরকালের প্রজন্মো। ... এই ভুগোলকের বিভিন্ন প্রান্তে তারা ছড়িয়ে আছেন; কিন্তু আসলে তারা একটি মানবগোষ্ঠী, যারা উৎপাটিত হয়েছেন তাদের স্বভূমি থেকে অনিশ্চিত অস্তিত্ব নিয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে কাটিয়েছেন বছরের পর বছর। এ এমন এক গোষ্ঠী, যেখানে শিশুরা চোখের সামনে নিহত হতে দেখেছে পিতামাতা, ভাইবন্ধুওকে ধরষিত হতে দেখেছে মা বোনকে, এই শিশুদের স্মৃতিতে আছে রক্তবর্ণ আকাশ, সর্বগ্রাসী আগুন আর পুড়ে যাওয়া ঘরবাড়ির দগ্ধশেশ; অভিজ্ঞতায় আছে, আশ্রয়ের খোঁজে মাইলের পর মেইল হেঁটে যাওয়ার দুঃসহ ক্লেশ, প্রিয় জন্মভুমির গাছপালা প্রকৃতিকে ছেড়ে আসার অশেষ যাত্রা’

শহর কলকাতার ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য পরিবার এই সদ্য ত্যাজ্য স্মৃতিকথার দগদগে ঘা নিয়ে অন্ধকার পথের বাসীন্দা হয়ে উঠল। লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাদের সামনে আলোকবর্তিকা জাবালিয়ে ধরেন নি ঠিকই কিন্তু কঠিন কঠোর বাস্তবের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কতটা নিচে নেমে যেতে পারে তাই দেখিয়েছেন বারো ঘর এক উঠোন’এ।

লেখক নিজেও কলকাতার মহানগরকে দেখেছেন নিজস্ব অভিজ্ঞতায়, কখনও মেছুয়াবাজারে দর্জিপাড়ায়, কখনোও বা শ্যামবাজারে অস্থায়ী আস্তানায় – তাই তাঁর মনের সঙ্গে গল্পের চরিত্রে আশ্চর্য মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

একটা কথা বলা দরকার। পারিপার্শ্বিকের প্রভাব আমার উপর পড়েছে। যখন যে পরিবেশে থেকেছি তখন সেই পরিবেশের “আমার লেখা এক অর্থে আমার আত্মজীনী। হয়তো আমার দেখা মানুষ আর পৃথিবীর ইতিহাস আর ভূগোলের খবরাখবরও তাতে আছে। ... খুটিয়ে খুটিয়ে না দেখে পারিনা, বাইরের ঘটনার সঙ্গে ভেতরের সত্যের মিল

খোঁজার চেষ্টা করি। ... মানুষের ভেতরে বাইরে কত কী ই না ঘটেছে অহরহ। কত ঘটোনা, ক্ত দুর্ঘটনা। (সাক্ষাৎকারঃ গৌড়াং ভৌমিক গৃহীত কলেজ স্ট্রীট)"

এই ঘটনার সমাবেশেই পাঠকের সাথে এক নম্বর ঘরের কমলা এবং আট নম্বর ঘরের শেখর ডাক্তারের সাক্ষাৎ হয় – দুই –ই উদ্বাস্তু। তাদের জীবনও পদ্ম পাতায় নীরের মত ভেসে থাকে।

সব সাহিত্যেই নায়কের প্রতিভূ খলনায়ক থাকে, তাদের পতনও হয়। অথচ জ্যোতিরিন্দ্র বারো ঘর এক উঠোনে এ সমাজে দুই বিষাক্ত চরিত্রকে শুধু বাঁচিয়ে রাখলেন না। জিতিয়েও দিলেন। পঞ্চাশ দশকে এদেরই তখন রমরমা বাজার। 'নবান্ন' নাটকে কালীধন অথবা ছেঁড়াতার নাটকে হাকিমুদ্দিকে আমরা দেখি উদ্বাস্তু বা বিশ্বযুদ্ধের বাজারকে কাজে লাগাত্তে, কিন্তু পরে এদের দুজনেরই পতন হয়, অথচ পারিজাত ও চারু উপন্যাসের সব চরিত্রকেই কম বেশি প্রভাবিত করেছে, সাধারণ মানুষ ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু এঁরা টিকে গেছে। পারিজাতেরই বস্তির লোকজনকে নিয়ে এই গল্প, পারিজাতই তাঁর চোরাকারবারীদের জন্য এক রমেশকে তৈরী করে, আবার রমেশের মৃত্যুর পর শিবনাথকেও নিজের কাজে লাগায়। চারু রায় খুব সহজেই পয়সার বিনিময়ে অভাবকে কাজে লাগিয়ে অমলের স্ত্রী কিরণকে রক্ষিতা বানায়, উপন্যাসের শেষে শিবনাথের স্ত্রী রুচিও তার বাহুলগ্নে চলে আসে। লোয়ার মিডল ক্লাশ সোসাইটি সম্পর্কে বিধুর সঙ্গে চারুর বক্তব্য সুস্পষ্ট।

জীবন সংগ্রাম পঞ্চাশ দশকে দেশে সমাজে অন্যমাত্রা পেয়েছিল। জীবনের নিজস্ব নিষ্ঠুরতা খুব কাছ থেকে, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর বিশ্লেষণ করে তারই ভাষাচিত্র পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্র চরম দারিদ্র্যের প্রতিচ্ছবি ছিল তার নিজের জীবন। হ্যারিকেনের আলোয় লেখা বারো ঘর এক উঠোন যেন তারই চিত্রনাট্য। সেখানে সুখক শান্তি বা প্রেমের অলীক উচ্ছবাসের কোনও অস্তিত্ব নেই। সেই কারণে জ্যোতিরিন্দ্র লিখেছেন –

"আমার দেখা ও জানা চরিত্রগুলির মধ্যে এমন একটি মানুষও ছিল না, যে এদের মধ্যে উপস্থিত থেকে মহৎ জীবনাদর্শের বাণী শোনাতে পারত।"

কারণটা অবশ্য অর্থনৈতিক সংকট। সেই কারণে বিধুমাস্টার নিজে একজন স্কুল শিক্ষক হয়েও সামান্য মাইনের জন্য টিউশন খুঁজতে থাকে। তাকে দেখে শিবনাথের বক্তব্য-

'মাস্টারগুলোওকে দেখলে আমার ঘেন্না হয়।' সারা মাস পড়িয়ে ১৫ টাকা তাও যোগাড় হয় না। তার স্ত্রীও শিক্ষিতা মহিলা। সন্তানদের রবীন্দ্ররচনাবলী মুখস্ত করান। কিন্তু অভাবের কাছে সবকিছুই মাথা নোয়ায় – তাই স্ত্রী হাসপাতালে যাওয়ার সুযোগে বড় দুই মেয়ে মমতা ও সাধনাকে বিধুমাস্টার ম্যাসাজ ক্লিনিকে কাজে ঢোকায়। সবচেয়ে বড় কথা পাঁচু ভাদুড়ীকে ম্যাসাজ ক্লিনিকের বুদ্ধিটা মাস্টারই দেয়, আর নিজের বড় ছেলেকে নিয়োগ করেন খদ্দের ধরার জন্য।

বিধুমাস্টারের মত সন্তানকে কাজে না লাগালেও নিজেকে অধঃপতিত করেছে বলাই। বলা যায় বারো ঘরের একমাত্র পুরুষ চরিত্র বলাই, যে নির্ভীক, সাহসী, সহজে মাথা নোয়াতে চাই না। তাই ভীরু শিবনাথকে একমাত্র সেই বলেছে –

"শেষ পর্যন্ত দেখব, ফলের কারবার গেছে সাবান ধরে ছিলুম, সাবানে সুবিধে হয়নি দেখে বেগুন ধরেছি। যদি তাতে সুবিধে না হয় জুতো সাফ করব। আর জুতো সাফ করেও যদি দেখি পেট চালাবার মতন রোজগার হচ্ছে না, তখন চুরি করতে আরম্ভ করব। সিদ কাটব, হ্যাঁ চুরি সুবিধে না হলে লোকের মাথায় বাড়ি মেরে গলায় ছোরা বসিয়ে টাকা আদায় করব ঠিক করে ছেখেছি। উপোস থেকে মরবার আগে একবার চেষতা করব..." রমেশের মৃত্যুর পরে শিবনাথ সেই স্থান নিয়েছে সেই বিষয়ে ব্যঙ্গও সেই করেছে। কিন্তু এই আদর্শ পুরুষ পঞ্চাশ দশকে ভূমিতে ধুলোয় লুটায়। তার প্রমাণ রেখেছ জ্যোতিরিন্দ্র। তাই অর্থের জন্য খুব সহজেই বলাইও রমেশের মারফত পারিজাতের অন্যায় কাজে শরিক হয়ে ওঠে। তখনকার সময় মানুষের নীতিগুলি এইভাবেই অপমৃত্যু ঘটে।

বঙ্গবিভাজন, উদ্বাস্তু আগমন, ক্যাম্প গঠন নারীদের উপর বেশি প্রভাব পরেছিল। গৃহাসগ্রয়ী জীবনে অন্দরমহলে ঝুরি নামিয়ে দেয় মেয়েরা। আন্তরিক প্রাণের টানে শিকড় নামিয়ে অনেক গভীরে। দাঙ্গা ও দেশ বিভাগ পরবর্তী দুর্দশাগ্রস্ত জীবনে ছিন্নমূল

মানুষ। সাধারণ দুঃখ দুর্দশার সঙ্গে মেয়েদের প্রায়ই সইতে হয়েছে অতিরিক্ত অসম্মান ও অবমাননা। সম্প্রদায় গত আক্রমণ চলে মেয়েদের উপর। সেই প্রমাণ আমরা পাই গার্গী চক্রবর্তীর কামিং আউট অফ পার্টিশনঃ রিফিউজি উওম্যান অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল" গবেষণা গ্রন্থে। জশোধরা বাগচী ও শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত তাদের "দ্যা ট্রামা এন্ড দ্যা ট্রাম্পঃ জেন্ডার এন্ড প্রোটিশন ইন ইস্টার্ণ ইন্ডিয়া" বইতে নারী হরণ, ধর্ষণের পর নারীত্বের অবমাননার জন্য তাদের বেশির ভাগ স্থান হয় ক্যাম্পে। ফলে তাদের মধ্যে দেখা দেয় বিবর্তন, পরিবর্তন নয়। নারী আর অন্তঃপুরবাসী না হয়ে বাইরের কাজে বেরিয়ে পড়ে। প্রশা গত দিক থ্রেকে তারা শিক্ষকতা, নাসির্ং, গর্ভর্নেসের কাজ, টেলিফোন অফিসে চাকরি – উপন্যাসে নারী চরিত্রেরা করে থাকে। কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নারীদের দেওয়ায়র পর, জ্যোতিরিন্দ্র বারো ঘর উপন্যাসে দেখিয়েছেন অভাব অনটন যন্ত্রণা নারীদের একমাত্র পথ যেন আত্মহত্যা করা বা জীবনের চোরা গলিতে নিজেক্লে সঁপে দেওয়া। এইটি একমাত্র বাস্তব বলে ধরে নেওয়া হয়। সেই কারণে বেবী রমেশ ক্ষিতিশের স্বীকার হয়, সাধনা মমতা নিরুদ্দেশ যাত্রা কবিতা ভুলে বাস্তবে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে। সুনীতি সিফিলিস রোগীর হাত ধরে বাড়ি ত্যাগ করতে কমলা বিবাহিত পুরুষের গলায় মালা দেয়, বীথি মোহিতের ভোগের শিকার হয়।

দেশ কালের সবচেয়ে বড় প্রভাব জ্যোতিরিন্দ্র দেখিয়েছেন অপশায়িত সমাজের সুস্থ সম্পর্কগুলি কীভাবে ভেঙ্গে যায় – বাস্তবে চড়া রোদে।

ক) দাম্পত্য অবক্ষয় দেখা যায় শিবনাথ রুচির সংসারে। পারিজাত দ্বীপ্তির ঘরে যে শিবনাথ নিজেই একদিন বলে দ্বীপ্তির মতো রুচি যদি তাকে ছেড়ে যাবে, তাহলে সে কি করবে ভেবে পাবে না। সেই শিবনাথ যখন শুনল চারু রায় তার স্ত্রীর সঙ্গে অন্তরং হয়েছে, তখন আপস প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে। তারও ঘরের দাস্মপত্য সুখ ভালো বোঝা যায় বিধুর মুখেও।

খ) সৌন্দর্য অবক্ষয় – প্রেম নয় শরীর, অবৈধ প্রেমেও মানসিক সম্মান, উত্তেজনা থাকে, কিন্তু শিবনাথ বীথির প্রেমে শুধু শরীরের গন্ধ পাওয়া যায়।

গ) মানসিক অবক্ষয় – মানুষের সমস্ত জীবিওন জুড়ে যখন হতাশা বিচ্ছন্নতাবোধ মূল্যবোধের অবমাননা ঘটে, যখন কোনো আলোর ইশ্রা নেই। মানুষের স্বপ্ন হয় না পূরণ, অসাম্য আর ব্যররথতার গ্লানি তাকে ঘিরে রাখে, তখনই বিকার জন্ম নেয় মানুষের মনের গহনে। কে গুপ্ত আমাদের ভাষায় মানসিক ভারসাম্যহীন। যদিও সে বিবেক। সেই ক্ষেত্রে সমাজের বিবেক নিজে অধঃপতিত নিজের সংসারে না মন দিয়ে পরস্ত্রীদের হপকিন্সের কবিতা আওরাই সে জানে চারু স্বভাবেরই লোক, অথচ বেবীকে তরুণী বয়সে সেই চারুর কাছে পাঠাবে। পাঁচু ভাদুড়ীর ম্যাসেজ ক্লিনিকে সাধনা – মমতা কি কাজ করে, কে গুপ্ত জানেঃ কিন্তু বেবীকে জেল থেকে ফেরত আনার পরপিতা হিসাবে ওই কাজে কন্যাকে সেই পাঠাবে অবক্ষয়িত সমাজের নগ্ন রূপ আর কীভাবে দেখানো যায়।

দেশ কালের গভীর প্রভাব জ্যোতিরিন্দ্রের মধ্যে দেখা গেছে বলেই তাকে কম সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়নি – কিন্তু নীরব দর্শক এই মানুষ্টি খ্যাতির চিন্তা না করে বিনা ভূমিকায় সমাজের কদর্য জঞ্জালকে তুলে ধরেছে – এই ভেবে যদি মানুষ সচেতন হয়। তিনি আমার সাহিত্য জীবন, আমার উপন্যাস, এ লিখছেন। -

“সেদিন ‘বারো ঘর এক উঠোন’ নিয়েও নানা মহল কম আক্রমণ করা হয়নি। বিদগ্ধ পাঠকের মধ্যে কেউ কেউ এই উপন্যাসে নিন্দার সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। তাদের বক্তব্য অনেকটাই এইরকম – ছিঃ এই সুবৃহত উপন্যাস লিহতে জ্যোতিরিন্দ্রকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে সন্ধেহ নেই। এবং এই গ্রন্থে নিঃসন্ধেহে যথেষ্ঠ শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তার সব শ্রম সব নৈপুণ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। প[রতিভার এমন মর্মান্তিক অপচয় সচরাচর দেখা যায় না। তিনি শুধু অন্ধকারি দেখেছেন নিজে যেমন আলো দেখতে পান নি ঠিক তেমনই তার এত গুলি চরিওত্রের মধ্যে একটি কেও তিনি আলোর পথে উৎত্রণের পথে নিয়ে যেতে সক্ষম হলেন না। এর চেয়ে দুখের আর কি হতে পারে।”- সুতরাং নিজস্ব ভঙ্গিতে দৃপ্ত লেখনী চালক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একথা যেমন সন্ধেহাতীত, তেমনি তার লেখা সেই সময়ের প্রাধান্য দলিল – একথা অনস্বীকার্য ।

১২.২ বারো ঘর এক উঠোন উপন্যাসে উপকাহিনী ও অপ্রধান চরিত্র

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্যকালীন লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে সর্ব জ্যৈষ্ঠ ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। (১৯২৯-১৯৮২)।এই গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী, রমাপদ চৌধুরী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল কর, বারীন্দ্রনাথ দাশ, প্রাণতোষ ঘটক, সুবোধ ঘোষ। এদের মধ্যে কেউ এসেছিলেন উত্তরবঙ্গের চা বাগান থেকে, কেউ এলেন ফরিদপুরের গ্রাম থেকে, কেউ এলেন দূরবর্তী শহর থেকে। এই কালপর্বে সময়ের গতি দ্রুত, পরিবেশ অস্থির ও নিয়ত পরিবর্তিত, চারদিকে ধবংস আর অবক্ষয়ের পাশাপাশি সংগ্রামের নবজীবনের বাণী উচ্চারিত। ফ্যানের গন্ধ, বারুদের গন্ধ, মড়ার গন্ধ, রক্তের গন্ধ যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ দাঙ্গা এরই মধ্যে পা ফেলে এগিয়ে চলেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র দ্বিতীয় বিধবযুদ্ধ সমকালে। তবে জ্যোতিরিন্দ্র ছিলেন সর্বাথে নাগরিক লেখক। লেখক নিজেই স্বীকার করেন – তাঁর রচনার বিষয় মানুষের সুখ দুঃখ, নৈরাশ্য নিঃসঙ্গ আত্মার কান্না, পাপ-পুণ্যের টানাপোড়েন স্থান পেয়েছে তাঁর রচনায়। সেক্ষেত্রে নিছক বহির্জগত নয়, অন্তর্লোক বা চেতন অবচেতন অন্তর্বর্তী অবচেতন মনে তাঁর গভীর রহস্য উদ্ধার করেছে তাঁর লেখনী। তিনি অভিনব ভাষা ব্যবহার করে চরিত্র গুলির মুখোশ ছিঁড়ে অবয়ব তুলে ধরেন।

উপন্যাস জ্যোতিরিন্দ্রের কোন ভিন্ন ঘটনা নয়, বিশেষত তাঁর তৃতীয় উপন্যাসে সমকালীন অবক্ষয়ের পূর্ণাং চিত্রটি ধরা পরেছে লেখকের স্বভাব সুলভ নির্মোহ নৈব্যক্তিক বিশ্লেষণে। ঐ কাহিনি নিয়ে তিনি ছোটগল্প লিখেছেন তা হয়তো বৈচিত্র্যহীন, কিন্তু ‘বারো ঘর এক উঠোন’ আগাগোড়া পাঠোকের কৌতুহল ধরে রাখে ধনিকের ছিলার মতো। কারণ বিষয় ও বয়ন নৈপুণ্যের সার্থক সাযুজ্য। সাধন ঘটে এই উপন্যাসে। যুগ চিত্র এই উপন্যাস। উপন্যাসের অন্তর্মহলে এবং বর্হিমহলে শুধু কাহিনির সমাহার – কোনটা প্রধান কোনটা উপকাহিনি বোঝা দায়। তাই বারো ঘরে আলাদা কোন কাহিনিওই নেই, প্রধান ও অপ্রধান মিলেই একটা যুগকে একটা সমাজ বিবর্তনকে ফুটিয়ে তুলেছে সেখানে অপ্রধান চরিত্রই একটা চালিকা শক্তি। লেখক

উপন্যাসের গঠন কৌশলে এক লেখ চিত্রের সাহায্য নিয়েছে। ঘড়ির কাটার মতো লেখক চরিত্র গুলির বিকাশ করেহেন। বারো ঘরের উপকাহিনিতে, আলাদা করে গুরুত্ব পায়, কিশোর কিশোরীর চরিত্র। কারণ তারা ভবিষ্যতের নাগরিক, অথচ তাঁর অন্ধকূপে; তাহলে গোটা বাংলা বা গোটা সমাজের অবস্থা কোনদিকে এগোয় সে বক্তব্য সুস্পষ্ট। কিশোরী চরিত্রের মধ্যে বেবী গুপ্ত অদিতি পাচি টেপি ময়না। কিশোর চরিত্রের মধ্যে ভুবলা নেপলা কানু মুকুল রনু। উপকাহিনীতে সন্তানের পিতৃভূমিকা বারো ঘরের নাগরিক কতটা অক্ষম সেই পরিচয়ও আমরা পাই- বাবী, কানুন – কেদার গুপ্ত, প্রীতি, বীথি – ভুবন বাবু অদিতি – রমেশ পাচী – পাঁচু ভাদুড়ী ময়না – বলাই মঞ্জু – শিবনাথ কানু রাণী মমতা সাধনা অজয় শশাংক নিলীমা চান সুমু ভুবলা পেল্লা – বিধুমাস্টার। উপকাহিনীতে প্রথম ঘরের অধিষ্ঠান কমলা গাঙ্গুলির। দাঙ্গার পর নারীদের মধ্যে কতটা বিবর্তন দেখা দেয় তা এই উপন্যাসে উপস্থিত। তারা আর অবগুণ্ঠিত থাকতে চায় না। পুরুষের সাথে পা মিলিয়ে অর্থ উপার্জনে স্বনির্ভর হতে চায়। সব নারী অর্থ আনে, যে সৎ পথে তা নয়, কিন্তু তবু সংসারের প্রয়োজনের তাগিদে পথে নামতেই হয়। বারো ঘরতের বাসিন্দা কমলা স্বাস্থ্যবতী, স্মার্ট, শিক্ষিতা, পেশায় নার্স তাঁর আচরণে প্রতিবেশি সুলভ ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ। বস্তুত বারো ঘরের শিক্ষা রুচি সম্পন্ন মূল নারী সুরুচির পরেই কমলার স্থান। অথচ এই নারীকে পুরুষ নারী মাঝে মাঝে সহ্য করতে পারে না। কে গুপ্তা র ভাষায় – সি ইজ নো মোর দ্যান বেবুসে। (৪ অধ্যায়)

আর প্রভাত কণার ভাষায় – মক্ষীনারী কিন্তু এই মেয়েটির উপকারে কমবেশি বস্তি বাসী লাভবান হয়েছে। ভুবন বাবুর মাছির ঝাঁক সন্তান দের মধ্যে বীথিকে সেই কাজ জুটিয়ে দিয়েছে। শিবনাথ সুরুচী – লাইজল এর কথা বলেছে। কমলার সংস্কৃতি মনস্ক সেই সুরুচিকে দিপালী সংঘের সদস্য হওয়ার প্রস্তাব দেয়। আলাপী মানসিকতার জন্য সুরুচীর সাথে বস্তির কিশোর কিশোরীর সাথে আলাপ করাই সে – ই কমলা বস্তির প্রতিটি কাজে দৃশ্যে অদৃশ্যে বর্তমান। যেমন কিরণোকে সুরুচি আটা ধার দিলে, কমলা রেশনের কথা বলে হুশিয়ার করে। অন্যদিকে প্রীতির মা ডাক্তার গিন্নি যখন ঝগড়া

বাঁধে টেলিফোন চাকরিকে কেন্দ্র করে কমলা ডাক্তার গিউন্নিকে উপদেশ দেয় ভদ্র ভাবে কথা বলার জন্য। বীথিকে নিজের একাউন্ট খোলার পরামর্শ দেয়। অথচ রুনু ও শিবনাথের কাছে কমলার কোনো দাম নেই। রনু তাঁর প্রেমিকা ময়না কে বলে, 'কমলাটা একেবারে বাজে মেয়ে ঠোঁটে রঙ মাখে আর নাকি সুরে টেনে টেনে কথা বলে ও কখনও ভাল মেয়ে হতে পারেও না। (অধ্যায় ৮)

অন্যদিকে বস্তির উঠোন ধোঁয়াকে কেন্দ্র করে কমলা কাজে ফাঁকি দেয় এবং বিনিময়ে বিধুর স্ত্রীকে চা খাওয়ায় – কিন্তু এই নারীর কাজ শিবনাথের পছন্দ নয়, ভয়ানক ফাকিবাজ মেয়েতা মতলব বাজ।'

কমলাও আধুনিক অবক্ষয়ের শিকার। সেই কারণেই সুরুচি এত শিক্ষিত হয়ে ইস্কুল শিক্ষিকা এটা তাঁর অপছন্দ। অফিসের চাকরিতে সে আরও বেশি মাইনে পেত এটা তাঁর মত। কারণ কমলার মতে – 'এ দিনে এই দুর্দিনে এতটা রুচি বাগীশ হয়ে লাভ কি, আরো কশট পাওয়া ছাড়া।' (অধ্যায় ১০)

তবে মুখে যাই বলুক সে তাঁর মনে নারী চিত একটা আরোপ থেকে গেছে। মেয়েতা যৌন প্রোডাক্ট জ্যোতিরিন্দ্রই কমলার মুখ দিয়ে বলিয়েছে – "কেননা বকুল জেনেছে, স্বাস্থ্যই মেয়েদের বড় সম্পদ, অস্ত্র যে মেয়ের শরীর সুন্দর না, তার মেয়ে জন্ম বৃথা। কথার শেষে কমলা একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলল এবং অনেকটা নিজের ম্নেই শেষ দিকে কথাটা বল।" (১৬ অধ্যায়)

এই বাণীই কমলার জীবনে চোরাস্রোত বয়ে আনে। তাই প্রকাশ্যেই বস্তিবাসীদের সামনে বিবাহিত শিশির বাবুকে নিজে রান্না করে খাইয়ে, সারা দুপুর এক ঘরে থাকে। ভবিষ্যতেও আমরা দেখি এই শিশির বাবুর অপ্ররথের জন্যই কমলা তাকে কোর্ট ম্যারেজ করে।

বারো ঘরের সাত নম্মবর ঘরের বাসিন্দা বিমল হালদারের সংক্ষিপ্ত অবস্থান উপন্যাসে। স্ত্রী হিরণকে নিয়েই বিমলের ছোট সংসার। উপন্যাসের প্রদাহ্ন চরিত্রেরা শিবনাথ ও রুচি যখন বস্তিতে আসে, সেই রাতেই বিমলের সাথে পরিচয় ঘটে পাঠকের। ১০ ন্মবর

ঘরের বধু কিরণের সাথে রমেশ গিন্নির আটা নিয়ে যখন তর্ক বিতর্ক চলে, তখন প্রমথর দিদিমা চিৎকারে বস্তি বাসীর চোখ পড়ে বিমলের ঘরের উপর। বিমল তাঁর জবালানী কয়লা ঘরের উপর না রেখে বারান্দায় রাখে। কিন্তু অভাবের তাড়নায় বলাই এর বউ আচলের ফাকে সেই কয়লা চুরি করে আনে। এই নিয়ে বাকযুদ্ধে লিপ্ত হয় বলাই। উপন্যাসে মধ্যপর্বে বিমল ফ্যাক্টরির ছাটাই কর্মী কিন্তু বউ এর উপর তাঁর শাসন থেকেই যায়। পুজোর ধনেখালি শাড়ই হীরণ ছিঁড়ে ফেলায় বিমল রাগে বলে – বলি কত বড়লোকের ঝি তুমি যে বছরে তিন জোড়া করে কাপড় লাগছে, অ্যাঁ বলো তুই কি ইচ্ছে করে এসব করছ নাকি, পরীক্ষা করছ ভাতার কত শাড়ি কিনে দিতে পারে, একবার দেখি?" এই ঘটনায় হিরণের কান্না তাকে একতূকূও শপোড়ড়ষ কোড়েণী, বোড়োঞ টাড় মোটে 'এশোব মেয়ে মানুষকে লোহার জালি পড়তে দেওয়া উচিত। নয়তো চটি।''(অধ্যায় ২২)

ডোম তলার আগুন দেখতে গিয়ে হিরণের অসাবধানতায় বিমলের ঘর থেকে কাসারের থালা চুরি যায়, এই থালা তে বিমল প্রতিদিন ভাত খেত – ফলে ডোম তলার আগুন হিরণের ঘরে জবলে অন্য মাত্রায়। উপন্যাসে ৪১ পর্বে আমরা দেখি বিমল পক্রে আক্রান্ত – 'বিমলের শুধু ছোট নয়, গাঁয়ে মুখে বড় গুটি দেখা গেছে, কাল তাকে হাসপাতালে যেতে হবে।'অর্থাৎ বস্তিতে আর একজন ঘর ছাড়া হয় নিজ ভাগ্যাকাশের জন্য। ১২ ঘরের সবচেয়ে প্রশংসনীয় ও এই রকম সমালোচিত বাসিন্দা রমেশ আট নম্বর ঘরের বাসিন্দা। কুলিয়া ট্যাংরা বস্তির পর বড় রাস্তার পর কিন্তু গলির ভিতরে রমেশের নিজস্ব দোকান। ইলেকট্রিক ঘুটি না থাকায় দোকানের সামনের দিক অন্ধকার – 'টিমটিমে একটা কেরসিনের বাতি জবলছে রেস্টুরেন্টের দেওয়ালে। দুটো লম্বা বেঞ্চ, একটা কেরোসিন, কাঠের টেবিলে কাঁচ পরানো দুতিনতী টিনে কিছু মুড়ি বিস্কুত ও টিনের চাকতি সাজিয়ে ক্ষিতিশের চায়ের দোকান ''- নামেই ক্ষিতিশ মালিক, কিন্তু প্রকৃত দোকান রমেশের। তবে এই ক্ষিতিশের দৌলতেই কেদার গুপ্ত বয়সন্ধি উর্ধব মেয়ে বেবী দোকানের কর্মচারী। সেই কারণেই সাধারণ ব্যঙ্গ করে বলে, - "চৌরঙ্গীর চায়ের মেম সাহেব মেয়ে মানুষ যেমন খদ্দেরকে চা এনে দেয়... না হলে বাবুরা ভিড়বে কেন? মধু না থাকলে ভোমরা আসে না। "(অধ্যায় ৮)

উপন্যাসে রমেশের সাথে শিবনাথ ওপাঠকেরচ সাক্ষাৎ হয় এই চায়ের দোকানে। রমেশ খুব কর্মঠ, সেই কারণেই কাজের ফাঁকি বা দোকানের অবস্থায় সে বিরক্তও, বেবীকে সে সর্বদা সাবধান করে, কারণ দোকান থেকে প্রায়ই কেক বিস্কুট চুরি হয়। এর পিছনে ক্ষিতিশের সম্মতি আছে জানে সে। তবুও ভাই গন্ডিবদ্ধ করার জন্য এই টুকু ক্ষতি সে স্বীকার করে। আবার দোকানের মর্যাদার ব্যাপারে সে সর্বদা সাবধানী – কুলি মজুরের জন্য ত্রুইপ্তি নিকেতন খোলা হয় নি।'

পাঁচু ভাদুড়ী বেশ্যা বাড়ি যাওয়া তে সিফিলিস থাকায় চায়ের দোকানে তাঁর প্রবেশ নিষেধ। উল্টোদিকে পাঁচুর বক্তব্য – রমেশ ঝারামজাদার খুব বার হয়েছে (চল্লিশ অধ্যায়)

শুধু বাদুড়ী নয়, বিশু মাস্টারের কাছে অসহ্য রমেশ। কারণ ছেলে কানুর দোকান খোলার জন্য বিধু বাবু কিছু টাকা ধার চায়, রমেশ দিতে অস্বীকার করলে বিধুর উক্তি – 'পাপ বাপকে ছাড়ে না'।

বস্তুত রমেশকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের নৌকা চালিয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্র। প্রধান চরিত্র শিবনাথের আর্থিকি সংগতি আসে রমেশের হাত ধরে। আবার বস্তির মালিক পারিজাতের ডানহাত এই রমেশই। বলাইওকেও নতুন জীবন সেই দান করে। পারিজাতের শুধু ব্যবসা নয়, অন্য তৃপ্তির কাজে সহায়ক ছিল এই রমেশ। তাঁর দোকানে অমলের যখন ১৯ টাকা বাকি থাকে, রমেশ তাকে প্রস্তাব দেয় তাঁর স্ত্রী কিরণকে পারিজাতের গেঞ্জি কারখানায় ঢুকতে, যদিও অমল সেই কথায় কর্ণপাত করেননি। পারিজাতের ইলেকশনের কাজ এবং চোরাকারবারের রমেশ যখন আর্থিক সংগতি উর্ধবে তখন বস্তির লোকদের কাছে সেই একমাত্র সমালোচনা যোগ্য। পাঁচু ভাদুড়ীর মতে, রায় সাহেব আর তাঁর ছেলে করছে পুকুর চুরু আর রমেশ করছে খানা ডোবা, কিন্তু পারিউজাতের উওক্তি – 'ব্রাইট ক্যারিয়ার ছিল, ব্যবসা বাণীজ্য এটা ওটা সবই সুনর বুঝত। ঘটনাচক্রে এই পারিজাত রমেশের মৃত্যুতে এতটুকু দুঃখিত হয়নি, কারণ তাঁর হাতে তখন শিবনাথ পৌঁছে গেছে। অথচ এই পারিজাতই রমেশের পরামর্শে চিংড়িঘাটার বরফ কল বসিয়ে। রমেশকে তাই একসময় আফসোস করত্যে

দেখি – 'পাঁচু ভাদুড়ী, বিধু মাস্টার, ডাক্তার আমার শত্রুমশাই, বলে বেড়াচ্ছে আমি রাই সাহেবের দালাল।''

শিবনাথের কাছে রমেশবড়াবড়ই কর্মঠ, মিতব্যায়ী, এবং ভবিষ্যতদর্শী, এক কথায় সাবধানী লোক (অধ্যায় ১৮)

অন্যদিকে সাধারণ লোকে তাকে চামার বলে কারণ সে সিনেমা মদ সিগারেটের ধারে কাছে নেই বলে। রমেশ নিজেও সেকথা জানে। হয়তো সেই কারণে শিবনাথের সাথে আলাপ হয় পলিসির পার্সেন্টের আশায়- "অমিয়কে খবর দেব পলিসি করে নিয়ে যাবে। এই রকম এক প্রতিভূ ছ্রিত্রের মৃত্যু সভাবাবিক ভাবেই শোরগোল তোলে খবরেটাই এখানে বড়। আগুনের হলকা ছড়িয়ে দিয়ে দমকা হাওয়া বয়, গাছ পালা ভেঙ্গে অরণ্যে ঝড় ওঠে, তেমনি সেই ভীষণ সতবাদ শুনে মস্ত উঠোন কেপে উঠল।" (অধ্যায়ত চল্লিশ)

মল্লিকার আর্তনাদে সকলেই খবরটা জানল, বেবীকে কেন্দ্র করেই ক্ষিতিশগ রমেশকে দা দিয়ে কেটে ফেলেছে। উপন্যাসের মুগ্ধ পর্ব থেকেই বেবীর প্রতি রমেশের দৃষ্টি আমরা জানি। বয়সন্ধি বেবীকে বরাবরই রমেশ একটু অন্য চোখে দেখেছে – এক দৃষতে রমেশরাই ফ্রক ছেঁড়া তাঁর হাঁটু দেখছে – (অধ্যায় ১৯)

রমেশ জের অনয় নারীতে আসক্ত, সে কথা আমরা পাঁচু ভাদুড়ী ও তাঁর স্ত্রীর কথোপকথনে জানতে পারি। বস্তিতে বেবীর মার আত্মহত্যা, বেবীর ভাই রুনুর ভমৃত্যুর অপেক্ষা রমেশের খুন একটা বড় ঘটোনার রূপ ধারণ করে। সেই অনুভূতিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কলম চলে – 'অবশ্য ভয়টা এই বাড়ির লোকের বেশি। বারো ঘরের একজন বাসিন্দা খুন হয়েছে... একটা কথা সরছে না কারো মুখ দিয়ে। হতভ্রম্ভ... স্থির শব।'(অধ্যায় ৪০)

রমেশকে লেখক এঁকেছেন বুদ্ধি ও শঠতার সঙ্গে। লোকটি শুধু নিজের ব্যাপারেই ওয়াকিবহাল নয়, বারো ঘরের লোকের গল্প সে জানে। পাঁচু ভাদুড়ীর সেলুনের ইতিহাস, শেখর ডাক্তারমেয়ে সুনীতির ইতিহাস, বিধু মাস্টারের পারিবারিক ইতিহাস,

শিবনাথ সুরুচির দাম্পত্যের ঝগরা এবং বস্তির মালিক পারিজাতের দাম্পত্যের চিতিহাসও তাঁর নখ দর্পনে। উপন্যাস পড়তে পড়তে আমাদের মনে হয়, রমেশ যেন উৎস এবং শিবনাথ সাংবাদিক আমরা শুধু পাঠ করে চলেছি। সেই কারণে এই মানুষ্টী হয়এ ওঠে এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব আইকন। তাই সাধারণ লোক শিনবনাথভ ও বলাইকে দেখে বলে 'এক রমেশ গেছে আর এক রমেশ গজিয়েছে। লম্বা লোকটি একগাল হেসে বেটে লোকটিকে বলেছিল এ তল্লাটেও রমেশ দের অপভাব হয় না। (৪০ অধ্যায়) এখানেই রমেশ হয়ে ওঠা সকলের চোখে যেমন ভউএর তেমনই বিস্ময়ের।

বারো ঘরের এক বাসিন্দা শেখর ডক্তার ও তাঁর স্ত্রী প্রভাবপণা তাদের এক মাত্র কন্যা সুনীতি ছাড়াও আর এক সন্তান মিন্টুর কথা উল্লেখ উপন্যাসে আলোচিত হয়েছে –

শেখর ডাক্তার উদ্বাস্তু, পাকিস্তান থেকে এসেছেন। তবে ভারতবর্ষে তাঁর ছোট ডিসেপেনসারী নিয়ে খুব খুশি তিনি, রাস্তার ওপর কাঁঠাল গাছতলায় তার একটা ডিসপেনসারী। 'সাইনবোর্ডে ডাক্তারের নাম শিবনাথ চিনেছে। একখানাও পুরে নয়, আলমারির নীচেটা ভেঙ্গে গেছে...কাথ দিয়ে সামনের দুদিকের মুখ বন্ধ করে রাখা।' (অধ্যায় ৭) যদিও তিনি বাসস্থান সম্পর্কে একটুও খুশি নন- 'এই বস্তি। ধূলো, মশা, মাছি, নর্দমা পচাগন্ধ শোঁকা মানুষ। '

তবুও তিনি আশাবাদী – 'পাগলা ডাক্তার ওধারে, একটা কলেরা কেস...জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী, ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকে শুরু হবে, জেনারেলি তাই হয় – জলটা' জেনারেলি তাই হয় – জলটা যখন পচতে আরম্ভ করে, মাছে পোকা যায়, কপিকে পোকা, বেগুনে পোকা – খারাপ আর যাচ্ছেতাই খাদ্য থেকে এসবের অসুখের সৃষ্টি'। (১৮ অধ্যায়)কলেরা রাগের এতবড়ো প্রত্যাশী বড় একটা দেখা যায় না।

সুনীতির মাট্রিকের পর অনেক সম্বন্ধ আসে কিন্তু বারো ঘরের পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য ভালো ঘর, সুপাত্র মেলা ভার। তাই স্ত্রী প্রভাতকণার পরামর্শে তিনি একটু তাড়াতাড়ি স্থান বদল করতে চান। সেক্ষেত্রে তাঁর পসরাও ভাল হবে। কারণ তাঁর কাছে খবর আছে – "টালিগঞ্জ বালিগঞ্জ না হোক, আস্ত গড়পাড় বাগবাজারের দিকেও চলে যেতে পারতেন তো অ্যাসোসিয়েশনটা ভালো পেতেন, হয়তো পসরাও

জমত ভালো।"(অধ্যায় ৪)কারণ তাঁর মামাতো ভাই ওখানেই গাড়ি বাড়ি করে ফেলেছে। তবে জেলে, ছুতোর কামার কুমোর ভাল ক্যান ইউ বিলিভ ... বেলেঘাটায় আমার দেড় হাজার টাকার ওষুধের দামই পাওনা আছে...জেন্টেলম্যানেরা খেয়েছেন... (অধ্যায় ১৪) কিন্তু বস্তিয়াসীদের কাছে পাত্তা না পাওয়ায় ডাক্তারের সাথে কে গুপ্ত বনমালী পাচু ভাদুড়ী কোন যোগাযোগ নেই। উলটে বিধুকে আত-আনা, এক টাকা ধার না দেওয়ায়, মাস্টার তার নামে দুর্নাম ছড়ায় বাজারে। প্রচন্ড ক্রোধে শেহর বলে ওঠেন – "ঐ বিধুমাস্টারের ঝাঁক, ঠিক আছে, একদিন একটাকে কলেরা দূরে যাক পেটের অউখে ভুগতে দেখি না... আমি একে বলি চাষাঢ়ে স্বাস্থ্য।"

শেখর ডাক্তার সাধারণ মধ্যবিত্ত, অত সমালোচিত হত অ্যাঁ, ইন্তু স্ত্রী প্রভাতকণাই তাকে বিড়ম্বনাই ফেলে/ প্রীতি সুনীতিকে টেলিফোনের চাকরির কথাবলতে, বস্তিকে মাথায় তুলে গালিগালাজ করে প্রীতির মাকে, ডাক্তারগিন্নী। প্রভাতকণার সারা উপন্যাসে একটাই বাণী, সুনীতির বিয়ে – যা বস্তিবাসীদের চক্ষুস্থূলের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, ঘটনা ক্রমে তার এক খুড়তুতো ভাই সুধীর এ বাড়িতে আনাগোনা শুরু করে। রমেশের কাছে আমরা জানতে পারি – 'অনেক তেল খেয়েছেন ডাক্তারের গিন্নি। সুধীরের মাথায় হাত বুলিয়ে... ভেটকি মাছ আর ধাপার বাজারের বড় বড় গলদা চিংড়ি ভেজেছেন।'(৩১ অধ্যায়) ফলসবরূপ সুধীরের সাথে অনেকদিন যাবৎ সুনীতি রেস্টুরেন্ট, সিনেমাহলে গেছে। কিন্তু একদিন, শেখর ডাক্তার কারেন্ত ইনিফরমেশন আনে, সুধীরকে বর তো করাই চলেই না বরং মেয়ের সাথে মিশতে দেওয়া উচিত নয় 'কারণ সুধীরের অসুখটি জটিল। সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য হয়েছে কিনা উমাপদবাবু ব্লাড একজামিন না করে বলতে পারেন না।' (২৭ অধ্যায়)

কিন্তু প্রভাতকণা অপারগ। তার মতে, মেয়ে ঝুকি নিলে চিন্তা কিসের। শেখর ডাক্তারের দাম্পত্য দুঃখ এখানেই – কানহারিনের যা সিম্পটম, বুড়োবয়সে প্রভাতকণা আজ তাতেই ভুগছে। স্ট্রং সেক্র্যাল ভিজায়াস্(২৯ অধ্যায়)। সুনীতি উপন্যাসের শেষে সুধীরের জন্য বস্তিত্যাগ করে ফলে লজ্জায় ডাক্তার দম্পত্তিওও বারো ঘর ত্যাগ করে। প্রতিবেশী কে গুপ্ত ব্যাঙ্গার্থে তাই বলে ওঠে-

‘ডাক্তারের মেয়ের ভিডি পেশেন্টের সঙ্গে পালানো, একেবারে সাংঘাতিক ব্যাপার যে। তার এ তল্লাটে প্র্যাকটিস করাই মুশকিল হয়ে পড়েচে। তারাতাড়ি পোঁটলা পুটলি নিয়ে এখান থেকে সরে গিয়ে শেখর তো বুদ্ধিমানের কাজ করেছে।’(৪৮ অধ্যায়)

বারো ঘরের পাঁচ নম্বর বাসিন্দা হলেন পাচু ভাদুড়ী এবং তার স্ত্রী যশোদা। পাঁচু ভাদুরির নিজস্ব সেলুম আছে ‘রাস্তার পার হুয়ে উর্বশী হেয়ার কার্টিং’... গদি আঁটা উঁচু উঁচু চেয়ার, চার দেয়ালে টাঙানো মোটা ফ্রেম বাধানো বড় বড় আরশি কাঁচ পরানো আলমারির চুলকাতার ক্লিপ, কাঁচি বুরুশ, শেভিং সোপ, ক্রিম পাউডার ডিবে ঝকঝক করছে(১৮ অধ্যায়)।

বারো ঘরের তিন নম্বর বাসিন্দা বিধু মাস্টার, বস্তির এই এক ব্যক্তির কোন পূর্ব ঠিকানা নেই। সে বৃত্তিহীন বা দেশ ছেড়ে কলকাতায় আসেনি, সুরবস্থার কারণেই সে বস্তিবাসী। স্থানীয় এক স্কুলে পড়ানো এবং গুটি কয়েক টিউশান নিয়ে তিনি বেজায় ব্যস্ত। নায়ক শিবনাথ তার জীবন কাহিনি দেখে বলেছে – ‘মাস্টারদের দেখলে আমার ঘেন্না হয়।’ সারাক্ষ গালে চাপ দাড়ি, মুখে বাজে গন্ধ, এবং অপরিষ্কারের জামা কাপড়ে তাকে দেখতে আমরা অভ্যস্ত। পারিজাত গিন্নীর মত তাই ভয়ানক ডার্টি এবং শিবনাথের ভাষায় জন্তুজানোয়ারের পরিণতি হয়েছে মাস্টার।

বিধুমাস্টার ও লক্ষ্মীমণির মোট দশটি সন্তান। পরে আরো দুটি মারা যাওয়ার পর বর্তমানে তেরোতম গর্ভবতী লক্ষ্মীমণি। এই অশিক্ষিত মানসিকতার জন্য বিধুবাবু সংসারে দারিদ্র। অথচ বস্তির শেখর ডাক্তার বার্থ কন্ট্রোল করার কথায় বিধু কাছে এটা ভয়ানক অপমান জনক মনে হয় বরং দাক্তার তাকে টাকা ধার না দেওয়ায় বিধু বাবুর বক্তব্য ‘ঐ পাকাটির মতো হাত পা ওয়ালা ডাক্তারের একদিন করোনারি থম্বোসিসি কি ঐ ধরনের সাংঘাতিক কিছুতে এটাক্ট করে হঠাৎ একদিন মরে যাবে।’ শিধু ডাক্তার নয় রমেশ তার শত্রু। কারণ ছেলে কানুকে ব্যবসায় নামানোর জন্য বিধুবাবু রমেশের কাছে টাকা চায়, কিন্তু রমেশ অস্বীকার করে। তাই রমেশের মৃত্যুতে বিধুবাবু ব্যঙ্গ করেন – ‘পাপ বাপকেও ছাড়ে না।’(৪০ পরিচ্ছেদ)

প্রথমে এই বিধু মাস্টারকে শিবনাথ পাঠকের যথেষ্ট বিচক্ষণ মনে হয়েছে। কারণ তিনি একমাত্র বলেছেন এটা বস্তি হলেও ভদ্রলোকের বস্তি এখানে লেখাপড়া করার রেওয়াজ আছে।(৪ অধ্যায়) অন্যদিকে তার স্ত্রীও হাতে টাকা পেলেই রবীন্দ্ররচনাবলী হেমচন্দ্র রচনাবলী কেনেন। বাড়ির বাচ্চারা সব ছড়া মুখস্থ বলে। অথচ তবুও এই ভদ্র পরিবার আজ বারো ঘরের কাছে হাস্যকর পাত্র। কারণ বিধু বাবুর অজ্ঞানতার জন্য। অতিরিক্ত সন্তানের জন্য তাদেরসবামী স্ত্রীর মনোমালিন্য হয়, কিন্তু লক্ষ্মীমণি দুর্বল, তাই আপোস করে বলে রুচিকে – কি করব দিদি। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, স্বামী মেয়েদের ধর্ম। কিন্তু তবুও এই ভদ্রমহিলা সংসারের প্রয়োজনে সব মুখ বুজে সহ্য করে, অথচ তবুও বিধু বাবু তাকে কম অপমান করে না। কখনও তাকে সিনেমায় নাম লেখাতে বলে তাকে ব্যঙ্গ করে, কখনও বা বাপেরর বাড়ি তুলে খোঁটা দেয়। সামান্য এক বার্লি কৌটো হারানোর জন্য বিধু স্ত্রীকে বলেন, এ সব স্ত্রী লোককে জীবন্ত পুড়য়ে মারতে হয়, পিঠে কাঠের চ্যালা ভাঙ্গতে হয়।(১৭ অধ্যায়)

টিউশুনি আর শিক্ষকতা ছাড়াও পাঁচু ভাদুড়িকে ব্যবসার কাজে উৎসাহ দেন। পরোপকারের জন্য নয়, কানুর একটা গতির জন্য। যে বিধুবাবু ছেলেমেয়েদের নেহেরুর বাণী শোনাত আরাম হারাম হ্যায়, সেই মাস্টারই ম্যাসেজ ক্লিনিকের কথা বলে। তবে সেখানে অন্য ব্যবসা চলে। কারণ বিধুবাবুর মতে এখানে অপোজিট সেক্স নিয়ে কারবার। বলতেই পাঁচু নিমরাজি হয়েছে। ... যেমন দেবতা তেমন তার নৈবেদ্য সাজাতে হয়, তবে দেবতা সন্তুষ্ট থাকে – হা হা। (অধ্যায় ৩০)

উপকাহিনিতে পারিজাত, চারু রায়, সন্তোষেরা এসেছে অনুঘটকের মতো। বস্তুত তারা বাস্তবকে সময়কালকে তুলে ধরতে চেয়েছেন, যেমন ফিল্ম মেক্যার চারু রায়ের বক্তব্য, - 'লিলুয়া থেকে আমি ডলিকে পেয়েছি, বাপ মাস্টার ঠিক নয়, টোলের পন্ডিত, আরো গোড়া আরো ভীরু কিন্তু কি করবে এর বর কি মান বড়। বরানগরের সুমিতার বাবা তো রিসার্চ স্কলার। তেমনি আমার মীরা চিত্রা পাখি বোস, টেবি রায়।' সে কারণেই কিরণও পরে সুরুচিকে নিজের জালে বন্দী করতে পারে সে।

চারু রায়ের মতো স্বার্থপর ও মধুলোভী হলেন পারিজাত – বারো ঘরের বাড়িওয়ালা। কুলিয়া – ট্যাংড়া বারো ঘরের বস্তিটি তার রায় সাহেব পইতার থেকে পাওয়া। অজস্র সম্পত্তির একটি ক্ষুদ্র অংশ। কিন্তু এই সম্পত্তিকে সে আরো বাড়াতে চায়, তাই বস্তি ভেঙ্গে আবাসন করা এবং ইলেকশনে দাঁড়ানো তার একমাত্র ঝোক হয়ে দাড়ায়। ক্ষমতা কেন্দ্রিকরণের জন্য রমেশকে কাজে লাগায়, পরে শিবনাথ বলাইওকে বশ করে। গণোতান্ত্রিক নির্বাচনে সেখাল একাল লক্ষ্য করা যায়। এরই মধ্যে কে গুপ্তের ছেলে তার চাপায় মরে যায়, কিন্তু অর্থের জোড়ে সেই বিচার বন্ধ হয়ে যায়। এলাকার মানুষের মনোযোগ ফেরাতে তৈরি রনু নামে সংঘ – সেখানে রনুর প্রেমিকা ময়না সয়াপ্তি সঙ্গীত গায় – বিনয় ঘোষ বলেছিলেন মহানগরে টাকা দিয়ে মানুষের বিবেক বুদ্ধি, মন সব কেনা যায়। পারিজাত তাই সওদা করে চলে।

ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ এই উপন্যাসে কার্যকরী হয়েছে অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম। নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখতে গিয়ে অনেক প্রাণি নিজের আকার আয়তন পরিবর্তন করেছেন, যারা পারে নি তারা পৃথিবী থেকে নিচিহ্ন হয়ে যায়। যেমন ডাইনোসোরাস। বারো ঘরের কে গুপ্ত নিজেকে পরিবর্তন করতে পারে নি। তাই তার পরিবার নিচিহ্ন হয়ে যায়। অথচ বিধু মাস্টার নিজ অস্তিত্ব বজায় রেখেছে সেই কারণে অনেক মূল্য চোকাতে হয়েছে, তাই আমরা সহজেই বলতে পারি, এই উপকাহিনিগুলি এক একটা ইট যার ফলে বারো ঘর এক উঠোন নামক ইমারত গঠন সহজ হয়েছে।

১২.৩ অনুশীলনী

১) বারো ঘর এক উঠোন উপন্যাসে সমকালীন প্রেক্ষাপট বর্ণনা কর।

২) উপন্যাসের নিরিখে অপ্রধান চরিত্রগুলির প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা কর।

৩) বিধুমাস্টারের চরিত্র উপন্যাসের ঘটনাপরম্পরার নিয়ন্ত্রণে কতখানি প্রভাব ফেলেছে।

৪) বারো ঘর এক উঠোনে সমকালীন দেশীয় পরিস্থিতি ও মধ্যবিত্ত সংকট কীভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে আলোচনা কর।

১২.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১) সমাজ আলেখ্যঃ বারো ঘর এক উঠোন – রানু বিশ্বাস, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

২) বাংলা সাহিত্য পরিচয়, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তুলসী প্রকাশন।

৩) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দেবেশ কুমার আচার্য, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি।

একক- ১৩ বারো ঘর এক উঠোন ও প্রধান চরিত্র

বিন্যাস ক্রম

১৩.১ বারো ঘর এক উঠোন ও প্রধান চরিত্র শিবনাথ

১৩.২ বারো ঘর এক উঠোন উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা বিচার কর

১৩.৩ অনুশীলনী

১৩.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১৩.১ বারো ঘর এক উঠোন ও প্রধান চরিত্র

“শুধু শিল্পীর দায়িত্ব হছে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো অন্য কিছু নয়, প্রতিবাদ বা স্লোগান নয়। কারণ আমার মতে সেটা শিল্প সংগত হবে না। কারণ আমি সচেতন শিল্পীর কমিটমেন্ট বলতেও আমি তাই বুঝি ” (কালপ্রতিমা সাক্ষাৎকারে জ্যোতিরিন্দ্র)

শুধু বারো এক উঠোন উপন্যাসে শিবনাথ বাবুকে আকা হয়েছে শিল্পীর দৃষ্টিকোণে, শিবনাথ ও শিবনাথের মধ্যে দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণি দর্শন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিশ্লেষণ ঘটেছে এই উপন্যাসে। আবার উপন্যাসের শুরুতে সে ব্যঙ্কের কর্মচারী। ব্যঙ্কফেল সাধারণ নাগরিক, ইস্কুল শিক্ষিকার স্বামী এবং এক কন্যার পিতা, স্বামী পিতার দায়িত্ব ও কর্তব্য কোনটাই করতে দেখা যায় নি তাকে। কলকাতার মুক্তারামবাবু স্ট্রীট ছেড়ে সে ওঠে বেলেঘাটার কুলিয়া ট্যাংড়া বস্তিতে বারো নাম্বার ঘরে। মনে একটাই প্রশান্তি বেশি দিনের জন্য নয়।’

শিবনাথ উপন্যাসে দর্শক বা সাংবাদিক লেখকের অন্যদিক বলা চলে। গোটা উপন্যাসের অবক্ষয়কে নিপুণ হস্তে সে তুলে ধরেছে। কে গুপ্ত তার কাছে ভিখিরি, বিধুমাস্টার, জন্তুজানোয়ার, পাঁচু ভাদুড়ি অদ্ভুতুরে শেখর ডাক্তার অলস। অথচ বনমালোর দোকানে

চারু রায় ও কে গুপ্ত তার আড্ডাবাজ বন্ধু, পাচু ভাদুড়ির সেলুনে বাকিতে চুল কাঁটা, বিধু মাস্টারের কাছ থেকে প্রতিবেশিদের সম্পর্কে নোংরা আলোচনায় লিপ্ত হওয়ায় তার রুচিতে লাগেনি। এটা সন্ধেহাতীত কে গুপ্ত উপন্যাসে বিবেক চরিত্র। যে মদ খেয়ে হপকিন্সের কবিতা আওরাই – 'Give beauty,' তার বিপরীত চরিত্র শিবনাথ একই মুদ্রায় দুটো পিঠ, একজন ধ্বংস হয়েছে, অন্যজন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সামান্য প্রতিবেশি সূত্রেই শিবনাথ কে গুপ্তকে পুত্র রনু কন্যা বেবি কন্যা সম্পর্কে সচেতন করতে পারতেন, সেখানে নিজে এক কন্যার পিতা। বরং রমেশের চায়ের দোকানে বেবীকে দেখে প্রথম দিনে চমকালেও গুপ্ত সাহেবকে বলার প্রয়োজন মনে করেনি, একই এওকম রমেশ ক্ষিতিশ যখন বেবির গাঁয়ে হাত তুলেছে তখনো কোন প্রতিবাদ করেনি। নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে। বেবীর কারণে রমেশের হত্যাকেও সে স্বাভাবিক বলে মনেছে। এর জন্য থানা পুলিশকে এড়িয়ে যাওয়ার অনেক চেষ্টা করেছে।

বেবীর জীবনের মতো রনু জীবন যখন ধবংসের পথে, সেখানে শিবনাথ মুক ময়নার রনুর ক্ষেতের গল্প, পারিজাতের গাড়িতে রনুর একসিডেন্ট, রনুর মৃত্যু কোনকিছুওই তাকে একবার বিচলিত করেনি। বরং রনুর প্রেমিক ময়না যখন সন্তোষের দিকে এগিয়ে গেছে, রুচির প্রতিবাদ থেকে শিবনাথ বলেছে, শুধু জীবন ও মৃত্যর সামনে দাঁড়িয়ে যখন হাত বাড়ীয়ে একটি মেয়েকে ডাকে, তখনহ তার দিকে ছুটে যাওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিক। ময়না কি ভুল করেছে তাকে তুমি দোষ দিতেও পারো না। একই রকম সুপ্রভাত আত্মফত্যা করে ধামা দিয়ে, সুওইসাইড হুবলা মারফৎ চুরি করে পারিজাতের কাছে পৌঁছে চৌর্য মনোবৃত্তি প্রকাশ করেছে। উপন্যাসে প্রায় সমগ্রই কে গুপ্ত ও শিবনাথের কথোপকথন লক্ষ্য করা যায়। শিবনাথ ভিখিরি কে গুপ্ত কে মেরেছে, কিন্তু এই কে গুপ্তই বনমালীকে শিবনাথের চরিত্রের একতী দিক তুলে ধরেছে। এসব লোক বুঝলি, এঁরা মুখে তা কখনও প্রকাশ করেনা। (অধ্যায় ২৪)। সায় দিয়ে বনমালীও বলে এই আদমি খুন করতে পারবে? অধ্যায় ২৪। সেই গুপ্ত শিবনাথের চোখে আঙুল দিয়ে নষত দাম্পত্য জীবনের চিত্র তুলে ধরেছে। বিবেকবান গুপ্তের মুখ

থেকে শিবনাথ জানতে পারে, চারু তার স্ত্রীকে 'কিস্ করছে – যদিও তাতে শিবনাথ খুব একটা বিচলিত হয়নি।

'শিবনাথকে ভাড়াটে হিসাবে পেয়ে বিধুমাস্টার একটু বিরক্ত হয়েছে। 'পারিজাতের চিড়িয়া।' পরে অবশ্য স্ত্রী শিক্ষিকা এবং এককালের অফিসে চাকুরে জেনে প্রতিবেশিসুলভ বন্ধুতব রেখেছে।' বিধু মাস্টারের বারো মধ্যে দশটি জীবিত সন্তানকে দেখে শিবনাথ প্রথমে নাক কুঁচকেছে, পরে হাসির খোরাক হিসেবে প্রসংটী ব্যবহার করেছে। বিধুবাবু আর্থিক কারণে টিউশনি নিয়েই ব্যস্ত থাকে। আর বর্তমান মার্কেটে টিউশনির চাহিদার থেকে জোগান বেশি থাকায় তা পাওয়া বেশ কষ্টকর জেনে শিবনাথ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে এড়িয়ে গেছে। একজন সংগ্রামরত মানুষকে দেখে শিবনাথের মনে হয়েছে সে জঘন্য জন্তু জানোয়ার, তাই খুব সহজেই যখন সুরুচি যখন সংসারের আয়ের জন্য কথা তখন শিবনাথ মন্তব্য করে –

"প্রাইভেট টিউশনি করা ছোটলোকের কাজ। দেখতে পাওনা বিধু মাস্টারকে! কি বা প্রসাদ কি বা চেহারা! মাস্টার গুলোকে দেখলে আমার ঘেন্না করে।"(১৩ অধ্যায়)

অথচ বিধু মাস্টার হয়ে ওঠে তার গল্পে প্রসঙ্গ, যখন সে রমেশের সাথে গল্প করে। আবার তার দুই মেয়ে সাধনা ও মমতা যখন পাঁচু ভাদুড়ির ম্যাসেজ ক্লিনিকে কাজ করে তখনও ঘটনাকে ব্যঙ্গার্থে ব্যবহার করে। অথচ ভাগ্যের পরিহাসে এই শিবনাথকে বিধু মাস্টারের কাছে দুইবার অপমানিত হতে হয়েছে পরোক্ষভাবে। প্রথমবারে স্বামী স্ত্রী ঝগড়ার সময় বিধুমাস্টার ছেলেমেয়েদের নেহেরুর বাণি আরাম হারাম হ্যায় উপদেশ দেন, এবং জনসমক্ষে সকলের সামনে হুবলা তাদের স্বামী স্ত্রীর ঝগড়ার কথা উল্লেখ করে। কিন্তু আশ্চর্য হুবলার উপর শিবনাথ বেশিক্ষণ না করে বরং নির্লজ্জ হয়ে সুপ্রভার সুইসাইডের নোট চুরি করতে সাহায্য নেয়। বলাই ও অমল চাকলাদারের অবস্থান যৎসামান্য উপন্যাসে কিন্তু তাদের মাধ্যমেই শিবনাথের চরিত্রে অন্তসারশূন্যতা লক্ষ্য করা যায়। অমল তার সুন্দরী স্ত্রীকে পারিজাতের গেঞ্জির কারখানায় কাজ করাতে চায় না, কারণ পারিজাতের চরিত্র খারাপ। রমেশের দোকানেও কমল টাকা ধার করে, রমেশ একই প্রস্তাব অমলকে করে, অমল রাজি না হওয়াতে রমেশের ক্ষোভ হিতৈষী

শিবনাথকে ক্রুদ্ধ করে – ননসেন্স। বিড় বিড় করে বল এখন শিবনাথ লোকটার মাথায় এখন কিছু নেই। অপমান করার অধিকার রমেশ রায়ের আছে। শিবনাথ রমেশ রায়কে আন্তরিক ভাবে সমর্থন করল।

একই রকম বলাই অও প্রথমে অসৎ সঙ্গে পড়তে রাজি হয়নি। সে ফলের ব্যবসাদার ছিল, সেটা ফেল করতেই সাবান বেগুণের ব্যবসা করেছিল – তার মতে – "জুতো সাফ করেও যদি দেখি পেট চালাবার মতোন রোজগার হচ্ছে না, তখন চুরি আরম্ভ করব, সিঁদ কাটড়ব, পকেট কাটব, হ্যাঁ চুরিতে সুবিধে না হলে লোকের মাথায় বাড়ি মেরে গলায় ছোঁড়া বসিয়ে টাকা আদায় করব ঠিক করে রেখেছি। তাই বলে ঘরের মেয়ে বউ এর রূপ যৌবন ভাঙ্গিয়ে পেটের ভাতের যোগাড় করতে যাবো না। "

বলাই এর এই পুরুষত্ব শিবনাথের মনে কোনো ঢেউ তুলতে পারেনি। বস্তুত উপন্যাসে একমাত্র পুরুষ, কিন্তু আমাদের প্রধান চরিত্র শিবনাথের কাছে অশিক্ষিত তাইও এমন গোঁয়ার।" না হলে বলাইএর কপাল পা কেটে গেছে পুলিশের লাঠি চার্জে, সেগুলি না ভেবে সে বউ মেয়ের সতীত্ব নিয়ে ভাবছে এই রকম অদ্ভূত জীব শিবনাথ ইতিপূর্বে হয়তো দেখে নি তাই স্বার্থপর শিবনাথ এর পূর্বে পৃথিবীতে আর কিছু ভাবো না ভাবো না ভাববার আগে কাঁটা জায়গা গুলোতে আয়ডিন লাগাতে চেষ্টা করত। ধার কর্জ করে যা হোক কিছু বাঁধা রেখে হলেও টাকা যোগাড় করে একটা অন্তত আন্টিটিটেনাস ইনজেকশন নিয়ে নিত।

বনমালি, বলাই, কে গুপ্ত, বিধু মাস্টার, পাঁচু ভাদুড়ুর সম্পর্কে শিবনাথের ধারণার জ্রন কি এক অদ্ভুত কথা, তার কানে তুলে দিতে সারাক্ষণ গলা বারীয়ে যেন অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে তারা তাকে জড়িয়ে ধরেছে, তেনে নিতে চাইছে নিজেদের মধ্যে। আবার নিজেদের নোংরামি, কুতসিতা, বীভৎসতার পঙ্কে ।" অথচ এই পাঁচু ভাদুড়ির উর্বশীর সেলুনেই টাকা ধার করে শিবনাথ দাড়ি কাটে, একই রকম রমেশের দোকানে বাকিতে চা খায়। আবার রমেশের অনুগ্রহেই পারিজাতের বাড়িতে টিউশনি পাই সে। স্বভাবতই রমেশকে ছাড়িয়ে উঠতে চাই, তাই বলাইয়ের মেয়ে ময়নাকে কেন্দ্র করে রনুর ঘটনায় সে হস্তক্ষেপ করে এবং প্রয়োজনে সুরুচিকেও কাজে লাগায়। ঘতোনাচক্রে রমেশ খুন

হতেই শিবনাথের রাস্তা আরো পরিষ্কার হয়, ফলে পারিজাতের একমাত্র ডান হাত হয়ে পড়ে শিবনাথ। সেই কারণে সাধারণ মানুষের তির্যক উক্তি ওঠে শিবনাথের দিকে। 'এক রমেশ মরলে আর এক রমেশ জন্মায়।'

কৃত্রিম অহংকারে আচ্ছন্ন এই গা ঢাকা ভদ্রলোক শিবনাথকে অবলম্বন জ্যোতিরিন্দ্র মধ্যবিত্ত জীবন দর্শন নয়, মুখ্যত দর্শনহীন জীবনেরই কথা বলেছেন। শিবনাথের চএইত্র ফুটে উঠেছে বিক্ষিপ্ত ঘটোনার মধ্যে দিয়ে –

প্রথমত, শিবনাথ খুব ভালো ভাবেই জানে কিভাবে গোটা পরিবার নিয়ে এই বারো ঘর বস্তির মধ্যে এসে তাদের উঠতে হয়েছে। হাতে পইয়সা নেই, ঘরেও নপয়সা নেই। তারপরেও অগ্র পশ্চাত না ভেবে দুপুরে, সাড়ে দু আনা মুদি দোকানদার বনমালীর কাছ থেকে ধার করে সে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে নতুন ডিজাইনের একটা এসট্রে কিনে নিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, শিবনাথ চোখের সামনে রাতদিন দেখে যাবতীয় অবস্থা ও বিপর্যয়ের মধ্যেও সুরুচি কীভাবে সামান্য মাইনে নিয়ে একা লড়াই করেছে। প্রাইভেট টিউশনি করে কিছু টাকা সে সংসারে জোগান দিতে পারত, কিন্তু তা করেনি। দুখে দুর্দিনে দুঃসময়ে মানুষকে অনেক সময় ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও মানুষকে অনেক কাজ করতে হয়, শিবনাথ বাস্তব ও সংসারের সেই সুগভীর প্রয়োজন বাদকে আদৌও বুঝতে চাইনি।

তৃতীয়ত, বাস্তব অবস্থার ও বাস্তব অবস্থান সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষেরই সর্তক ও সচেতন থাকা উচিত। শিবনাথের মধ্যে সেই সচেতনতা আদৌ ছিল না। প্রয়োজনে মিথ্যুয়া কথা বলতেও যে তার কোনো রকম দ্বিধা বা জড়োতা নেই, বন্ধু মোহিতের সঙ্গে দেলখা করে সুরুচি 'বিকলায় ইনফেকষন হয়েছে বলে ৫০ টাকা ধার করে আনে।' ফেরার সময় বাসের আয়নায় দেখে ভাবে – কত অভিজাত কত ভদ্র এই চেহারা' এটাকে বলা উচিত নয় কি আত্মপ্রতারণা? শিবনাথ হয়ে নিরুত্তাপ, প্রতিবাদহীন। এই মেরুদণ্ডহীন পুরুষটি বরং পারিজাতের কাছ থেকে বরং দুহাজার টাকা চেক পেয়েই খুশি।

চতুর্থত, সুরুচি সারাদিন উদয়াস্ত পরিশ্রম করে অথচ একই ঘরের বাসিন্দা শিবনাথ এক ও অদ্বৈত আকর্ষণে কলকাতার লাইটহাউসে সিনেমা দেখে। অন্যকে বঞ্চিত করার যে আত্মসুখ সেই নির্লজ্জ স্বার্থপর আমরা দেখি। তার পর দালো একটা দোকেন চা খায় (যেখানে সে রমেশের চাদোকানের ধারের খদ্দের)

পঞ্চমত, বেবীর মায়ের জ্বর দেখতে সুরুচি যেতে চাইলে, কারণ বেবীর ভাই রনুর সাথে পারিজাতের বর্তমান গণ্ডোগোল উপস্থিত। তাই সেই পরিবারের সাথে সুরুচির অন্তরঙ্গতা শিবনাথের ব্যক্তিগত স্বার্থে আঘাত হানে এমনটাই যে অমানবিক আবার সুরুচির সাতে কথা কাটাকাটিতে একটা কাঁচের গ্লাস ভাঙলে সুরুচি এই আকালের বাজারে আঘাত পায়। অদ্ভুত শিবনাথ সেই স্ত্রীর আন্তরিক দুঃখ বুঝতে পারে না। এক পলায়নমুখী, ভীরু, কাপুরুষ অন্তর্মুখী শিবনাথ নামক ভদ্রলোকের জীবনে অবশেষে লেখক উত্তোরণ দেখালেন না তাহলএ হয়তো জ্যোতিরিন্দ্র বাবুকে সমালোচনামুখী নেতীবাচক শব্দের মুখোমুখির সামনে পড়তে হত নবা। এর কারণ দেশ কালের ছায়া একদেশদর্শ একাগ্রতার বলতে চাইলেন্ম ডেকাডনন্সের চাহারা হল সজৃংখল হী যৌন যাপন ‘আমি যে সব চরিত্রকে দেখেছিলাম, তারা জীবিকার অনবেষোণ কাহোয়া সিউখ মৈন্থুন সন্তান উদপাদন ও পরস্ত্রীর প্রতি কার্মাত চোখে তাকিয়ে থাকা আর কিছু করত না, এর অতিরিক্ত তারা কোনো দিন কিছু করতে না।’

১৩.২ নামকরণঃ বারো ঘর এক উঠোন

নামকে যারা নামমাত্র মনে করেন আমি তাদের দলে’ – মধ্যে কাব্যের উপেক্ষিতা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যখন এমন কথা বলেন, তখন বোঝা যায় যে, নামকরণ বিষয় টি রবীন্দ্রনাথের কাছে নান্দনিক। সাহিত্যে নামকরণ মূলত তিনপ্রকার –

১) নামভাবনা বা চরিত্র ভাবনা মূলক।

২) ঘটোনাধারা

৩) ব্যঞ্জনাধর্মী

নাম্ভাবনায় চরিত্র কেন্দ্রিক অর্থাৎ মূল চরিত্রই প্রধান তার কার্যক্ষমতায় পুরো উপন্যাসকে টেনে নিয়ে নিয়ে চলে – রাজসিংহ, গোরা, শ্রীকান্ত কোনো কোন উপন্যাসে ঘটনার জন্য অরিত্রগুলো বেশি আকর্শিত হয়। চরিত্র গুলির দোষ ত্রুটিভালো মন্দ নির্ধারিত হয় ঘটনার জন্যই। এই ধরনের উপন্যাস বিশঢয় থেকে বিষয়ান্ততে যায়। যেমন – 'মামলার ফল, গৃহদাহ, কৃষষ্কান্তের উইল'। আধুনিক সাহিত্যে ব্যঞ্জনা ধর্মী নামকরণের চলই বেশি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই ১৯০৩ সালে চোখের বালি নামকরণে ব্যঞ্জয়নায় প্রভাব আনেন। নামকরণে তিনি একটু বেশিওই সাবধানী। তাই নাটকে যক্ষ পুরী নন্দিনীর পর রক্তকরবী নামকরণ আসে। - সেটাও পুরো ব্যঞ্জনাময় মানিক বন্দ্যোপাধায়ের পুতুল নাচের ইতিকথা গোটা মানব জাতির ব্যঞ্জনার প্রতীক। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীও নামকরণে সিদ্ধ হস্যত ছিলেন। তাই আধা নাগরিক জীবনে একদল জুবতীর কর্মক্ষতা কীভাবে বিপর্যস্ত করে সেই দিকে ব্যঙ্গ করে প্রথগম উপন্যাসের নামকরণ করেন সূর্যমুখী। একই রকম লালসা ও লোভ নূরজাহান সৃষ্টি করে, তার প্রমাণ মীরার দুপুর – কারণ মীরার সব পাপ দুপুরেই ঘটে। তবে তৃতীয় উপন্যাসে জ্যোতিরিন্দ্র আর ব্যক্তিতে বা নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ থাকলেই না । - তিনি একটি যুগ কে বলা ভাল বিবর্তনকে তুলে ধরলেন। তাই উপন্যাসটি হয়ে উঠল ব্যষ্টিবাচক নয় সমষ্টিবাচক – 'বারো ঘর এক উঠোন'।

পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, শিবনাথ মূল চরিত্র তাহলে উপন্যাসের নামকরণ শিবনাথের বাড়ি বদল হল না কেন? লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন পূর্বাশায় (তারিণির বাড়ি বদল বলে আমার একটা গল্প বেরোয়। আমি চিন্তা করে দেখেছি বারো ঘর এক উঠোন আমার সাহিত্য জীবন কিন্তু উপন্যাস টির শুধু শিবনাথের সমস্যা তো নয়ই আরো এগারো টা পরিবার শুদ্ধ বাংলা সমাজের সমস্যা। সেক্ষেত্রে নামকরণটি সার্থক হতো না। একই রকম প্রধান চরিত্র সুরুচি ও একটি ভারী চরিত্র। মীরার মতোই তার পদস্থলন হয়, সেক্ষেত্রে মীরার দুপুর উপন্যাসের নামকরণের মতো এই উপন্যাস অও ব্যক্তি কেন্দ্রীক হতে পারত। কিন্তু সেক্ষেত্রে অন্যান্য নারী চরিত্রগুলিকে অবমাননা করা হয়, তৃতীয় পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, উপন্যাসের নামকরণ গোষ্ঠী জীবন হলো না কেন, সেক্ষেত্রে বিওলা যায় বস্তির জীবন কাহিনী সব কালে সব

স্থানে সমান নয়, সমরেশ বসুর বিটি রোডের ধারে উপন্যাসে মূল আলেখ্য বস্তি, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ রাজনীতির দিকে মোর নেয়, সেই দিক থেকে সামগ্রিক বোঝাতে বারো ঘর এক উঠোন নামকরণ যথেষ্ট তাৎপর্যবাহী হয়েছে। নামকরণেই লেখক ধরিয়ে দেন কাহিনির মূল সূত্র। তার জাদু লেখকনীওর প্রবেশ কাহিনি অন্দরমহল, কখন বহিরমহল, কখনও প্রস্থান। কিন্তু পাঠক বোঝার আগেই কাহিনির ইওতি। মানবহৃদয়ের রুদ্ধ কুঠুরি, দর্শন ও সমাজ বিজ্ঞানীর দুর্বোদ্ধ প্রশ্ন পাঠ নিতে নিতে চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে চরিত্রগুলো, কাহিনি শেষ হলেও রেশ মোছে না। বারো ঘরের প্রেক্ষাপট দাঁড়িয়ে লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লেখকপত্নী পাড়ুল নন্দী 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাস সম্পর্কে এক সাক্ষায়কারে বলেছিলেন –

তখন রাম চাঁদ লেনের বাসা ছেড়ে আমরা চলে গেছি বেলেঘাটা বারোয়ারী তলা লেনে। এখান কার বাসাটা অদ্ভূত। বাড়ির মাঝখানে বড়ো উঠোন, আমরা ভাড়াটেও থাকতাম সব মিলিয়ে এগারো ঘর। সবার জন্যই ওই একট আউঠোন, কত বিচিত্র পেশার মানুষ যে আমাদের সঙ্গে কেউ কাজ করত দোকানে, কেউ আবার নার্স। বেশির ভাগই পূর্ববঙ্গের। উপন্যাস এক্ল দঙ্গল বাচ্চার কোরাস কণ্ঠে লেখক জানিয়েছেন, যার নেই পুঁজিপাটা, সে যায় বেলেঘাটা, অর্থাৎ নগর কলকাতার অদূরে নোংরা দুর্গন্ধ মত এলাকা বৃত্তিহীনমানুষের মুক্তাঞ্চল। কেমন তার পরিবেশ?

তারপর একটা গেঞ্জি কলের খটখট শব্দ, একটা করাত কলের ঘসঘস আওয়াজ... ঘেটু ফুলের গন্ধ শুকতে শুকতে হাঁটা পথ। রিক্সা যায় কিনা বোঝা গেল না। এই রকম পরিবেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির প[রতিনিধু শিউবনাথ, সঙ্গে স্ত্রী রুচি। সঙ্গে এগারো বয়সী কন্যা মঞ্জু। সেখানে আলাপ্ল হয় বারো পরিবারের সঙ্গে। তারা সকলে আকৃতি দিক থেকে ভিন্ন কিন্তু স্বভাবধ্ররমে এক, আড়ি পেতে অন্যের ঘরের গল্প শোনা, নিজের সবচ্ছলতার কথা একটু বাড়িয়ে চেচিয়ে বলা ঝগরা করা। আবার ভুলে গিয়ে সকলে মিলে আদির সাত্মক গল্পে মেতে ওঠে। এই চরিত্রের বাস্তব উপস্থিতি কিন্তু আমরা লেখকের মধ্যে পাই। বারো ঘর লেখার আগে কিছু দিনের জন্য একটা বাড়িতেদ বাস করতে হয়েছিল, তা বলে সেখানে কে গুপ্ত ছিল না। বা পাঁচু ভাদুড়ী রমেশ, বিধু মাস্টার, কি রুচি শিবনাথের মতো শিক্ষিওত দম্পত্তি দেখে নি। কেবল একটি উঠোঙ্কে

গফহিরে বারোটা পরিবভারকে দেখেছিলাম, এই আত্মজৈবনিক বাণী ছাড়াও লেখক স্বীকার করেন, লেখকের যখন চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর তখন জীবনের কোনো না কোন অ সময়ের দর্জি পাড়ায় বা মেছুয়া বাজারে চ্চএইত্র দের আনাগোনা দেখেছেন। উপন্যাস শুরু হয় অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে। দি গ্রেট হিমালয়ান ব্যাঙ্কের ম্যানেজার শিবনাথের চাকরি নেই, তাই পরিবার নিয়ে পয়তাল্লিশ টাকার ফ্ল্যাট বাড়ী নিয়ে আটারো টাকার বারোয়ারী ঘরে মাথা গোজে তারা। কিন্তু উল্লেখের বিষয় রুচি একট মেয়ে হয়ে বসতি জীইবন মানাতে নাজার অথচ পুরুষ শিবনাথের কাছে মোড়ে আড্ডা বড় বেশি স্বাচ্ছন্দ্য মনে হয়। এবং এক সময় ধারাবাহিক ভাবে বাড়িওয়ালার পাড়িজাতের দালাল বনাম বস্তির ক্ষয়িষ্ণু জীবাণু হয়ে ওঠে সে।

শিবনাথের অহংকার ছিল দুটি উপন্যাসের শুরুতে ফ্ল্যাট বাড়ির বাসিন্দারা ব্ল্যাক মার্কেটে ফুটানি মারে। তাই এদের সুখের নীড় ভাঙছে, থাকছে না কিছু। আর দ্বিতীয়ত রুচির প্রতি আশ্বাস বাণী – 'থাকব তুমি আমি থাকবে ভালোবাসা।' কিন্তু সেই ফ্ল্যাট বাড়ির সংখ্যা তো বেড়েছেই আর সংখ্যায় তেতাল্লিশ পর্বে শিবনাথের ভালোবাসাও মুখ থুবড়ে পড়েছে। কারণ সেও খুটে দেওয়া স্বামীদের দলে। অর্থাৎ এঁরা স্ত্রীদের সাহায্য করেন, কিন্তু নিজের জীইবনের উৎত্রণের পথ খোঁজেন না। এই শিবনাথের চোখ দিয়েই বস্তিবাসী দের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়। বারো ঘরের বিখ্যাত বাসিন্দা শিবনাথের প্রতিবেশি কে গুপ্ত ইংরেজি তে এম এ মার্চেন্ট কোম্পানির অফিসার। অথচ বনমালীর দোকানে বসে চা খায়, মেয়ে বেবীর কাছে পয়সা চাই মদ খাওয়ার জন্য। শিবনাথের কাছে দুয়ানির জন্য হাত পাতে। আবার পরস্ত্রীদের দেখলে হপকিন্সের কবিতা আওয়ার। সন্তান রুনুর মৃত্যু কামনা ও বেবীকে দেহ ব্যবসায় নামাতে সে পিছপা হয় না। সব শেষে স্ত্রী আত্মহত্যার পর অতৃপ্ত আত্মার মতো সারা বস্তিতে ঘুরে বেড়ায় – বারো ঘরের এও এক করুণ ইতিহাস। দাঁটি ভাঙা কাপ, কলাইও চটা ডিস, হাতল ভাঙা মগ, ফাটোল ধরা আয়নার টিও ফেলা যায় না মধ্যবিত্তেরচ সংসারে।, সবই অত্যাবশ্যকীয়। বিশেষত দুর্মূল্যের বাজারে, অথচ ফাটা আয়না তো ধরা পড়ে সহজ অবয়ব কিন্তু বারো ঘরের ইতিহাস তাদের নিজেদের কাছে ধরা না পড়লে জ্যোতিরিন্দ্রের কলমে ফুটে ওঠে পাঁচু ভাদুড়ী, রমেশ, বিধু মাস্টার, শেখর ডাক্তার কে

গুপ্ত কে সহ্য করত্রে পারে নি শিবনাথ। দেখেছে সবই নিম্ন মানসিকতা সম্পন্ন। কিন্তু এদের প্রত্যেকের গতি কিন্তু ভিন্ন। স্বভাব ও গতি এক হলে উপন্যাসের নামকরণ কখনোইউ বারো ঘর হতো না। এখানে এক উঠোন প্রতীক হয়ে উঠেছে স্বভাব নিম্নরুচি কিন্তু বারো ঘর অবস্থান ও ষেষ গতিতে ভিন্ন বারো ঘর।

১২ টা পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র। এক উঠোন – বারোটা পরিবারের একই স্বভাব, নিম্নতা। এখানেই নামকরণ আরো সার্থক। পাঁচু ভাদুড়ীকে ভকেউ সহ্য করতে পারে না। রমেশ তাকে চা খেতে দেয় না। অথচ উপন্যাসের শেষে পাঁচু ভাদুড়ী অন্যায় কর্মেও মাথা তুলে দাঁড়ায়। রমেশ খুন হয়। যে রমেশ শিবনাথের আর্থিক উন্নয়ন করে। ভাই ক্ষিতিশ কে দাড় করায়। পরিস্থিতির জটিলতায় সে দাদা রমেশ ক্ষিতিশের হাতে খুন হয়, রমেশের উন্নয়নের স্থান শিবনাথ দখল করে।

শেখর ডক্তার রোগী পাওয়ার জন্য কলেরা প্রত্যাশা করেন, অথচ তার নিজের মেয়েই সুনীতি সিফিলিসের সঙ্গে গৃহত্যাগ করে, বিধু বাবু মাস্টার, পুত্র কন্যাকে নেহেরুর বাণি শেখায়। আরাম হারাম হ্যায়। অথচ স্ত্রী নার্সিং হোমে যাওয়ার সুবাদেই মেয়েদেরকে দেহ ব্যবসায় নামিয়ে দেয়, সেই ব্যবসায় খদ্দের ধরে আনে, তার নিজের ছেলে, ভুবনের দুই মেয়ে, প্রীতি ও বীথি অন্ধকার জীবনে হারিয়ে যায়। তাদের জীবনের গতিপথ শুরু হয় সাধারণ মেয়ের মতো, কিন্তু অভাবী সংসারের জন্য বীথি আয়ার কাছ ধরে যা ভবিষ্যতে রক্ষিতা হয়ে দাঁড়ায়। ১নং ঘরের বাসিন্দা কমলা যাকে কে গুপ্ত বলেন, ব্বেবুশ্যে অথচ স্মার্ট চটপটে মেয়ে বলে তাকে এক ডক্তার তাকে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু বারো ঘর ত্যাআগ করে এক বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে। শুধু নিম্নবিত্ত বারো ঘরের ইতিবৃত্ত এখানে নেই, বারো মালকিন দীপ্তি পারিজাতের স্ত্রী বহু সন্তানের জননী কিন্তু সমাজের অভিশাপ তাকেও ছোবল মারে সেও গৃহত্যাগ করে মন্টুর সঙ্গে।

বারো ঘর এক উঠোন আদতে একটী বস্তি। যদিও বিধু মাস্টারের বক্তব্য এটা ভদ্রলোকের বস্তি কিন্তু এই বারো ঘরকেই ভাঙ্গিয়েই পারিজাত তার লাভ লোকসানের হিসাব রাখে। সমাজ নেতা পারিজাত সামনে ইলেকশানের জন্য প্রথমে রমেশ পরে শিবনাথকে ব্যবহার করে, যারা বারো ঘরের বাসিন্দা। আবার গুপ্ত র ছেলে রনু বারো ঘরের কিশোর, মারা যায় পারিজাতের গাড়ির এক্সিডেন্টে, তার মৃত্যুকে চাপা দিতে

দীপালি সংঘ তৈরি হয়, যার সভাপতি শিবনাথের স্ত্রী রুচি হয় এবং সভার সমাপ্তি সঙ্গীত গায় রুনুর প্রেমিকা ময়না, রুচি ময়না সকলেই বারো ঘরের বাসিন্দা। অর্থাৎ উপন্যাস শুরু হয় একটাপরিবার (শিবনাথ) তারপর সেটা মেশে তার ছায়া পঞ্চাশ দশকে দেখা যায়। নদী থেকে সাগর ও পরে মহাসাগরে যেন উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ছড়িয়ে যায়। তাই অন্য নামকরণ হলে তা সংকীর্ণ হতে পারত। 'বারো ঘর এক উঠোন হয়ে উপন্যাসটির নামকরণ সার্থক হয়েছে।'

বারো ঘরে উত্তরণ চরিত্রে ছিল রুচি। কিন্তু আমরা দেখি প্রথমে দীপ্তির বৈভবে তার স্বাতন্ত্র্য ক্ষুন্ন হবার ভয়ে সে ভীত। ক্রমশ দীপ্তি চলে যাবার পর আহ্লাদিত রুচি সভাপতি পদ অলংকৃত করে। নিজের সৌন্দর্য ভাঙ্গিয়ে স্বামী শিবনাথের সুবিধা আদায় করে পারিজাতের কাছ থেকে আবার চারুরায়ের ব্যাপারে উতসাহী হয়ে পরে, স্বভাব চপলা রুচি ক্রমশ প্রগলভ হয়ে পরে। রুচির মত শিবনাথের বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তার নিজস্ব রুচি জলাঞ্জুলি দেয়। অষ্টাদশী বীথির উন্মোচিত শরীর দেখে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়- 'চরম ব্যররথতা ভুলে কে গুপ্ত যেমন মদকে আশ্রয় করেছে, তেমনি বেকারত্ব ভুলতে সে মনকে অন্যদিকে ব্যপৃত করেছে।' বড় দুঃখ ভুলতে বড় নেশা এবং ছোট দুঃখ সে ছোট নেশা করে। অথচ এই শিবনাথকে যখন বীথি পাত্তা না দিয়ে বস্তি ত্যাগ করে তখন শিবনাথ তাকে রক্ষিতা বলেছেন। অর্থাৎ উপন্যাসের গল্প আর মূল কাহিনি চরিত্র শিবনাথ এক রুচিতে আটকে থাকল না। তা শাখাপ্রশাখা বিস্তার করল বারো ঘরে। হাজারটা ফুটো হাজারটা জোড়াতালি দিয়ে বারোঘরের বারোমাস্যা এগোয়।

জ্যোতিরিন্দ্র আআমাদের আলোচ্য উপন্যাস বারোটি পরিবারের ছবি তুলে ধরেছেন। এইউ প্রসঙ্গে তিনি নিসন্ধেহে একজন বাস্তববাদী লেখক। সুতরাং এই সামাজিক মানুষকে কিভাবে ভেঙ্গেছেন – প্রশ্ন থেকে যায়। এই প্রশ্নের উত্তরে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জানা – "মানুষ হিসাবে এঁরা একটা শ্রেণির হলেও প্রত্যেকেই আলাদা, এখন একরকম। আবার একটু পরেই সে বদলে যায়। তাদের রূপ সকালে একরকম, বিকেলে ঠিক তার বিপরীত। এই যে ব্যাপারটা তার নিপুণ শব্দের মধ্যে পাওয়া যায়। ... তিনি একটা অরণ্যের গাছের কথা বলতে গিয়ে কখনও শুধু গাছের কথা বলেন না

। গাছের প্রতিটি পাতার শিরা উপশিরার ক্রন্দন বলে দেন।" (চা-টেবিলে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী)

অর্থাৎ এই গাছটি হল উঠোন আর পাতা শিরা উপশিরা ডালপালা হয়ে ওঠে বারো ঘর। সেই ক্ষেত্রেও উপন্যাস্টির নামকরণ সার্থক। উপন্যাসের কিছু চরিত্রের মুখেও অন্যভাবে নামকরণ শোনা যায়। শেখরের কথায় – 'এ কি আর গেরস্তবাড়ি বলা চলে, আমি বলব হোটেল। হোটেলবাণী বারো খানা কামরা। কেদার গুপ্তের ভাষায় – পারিজাতের বাবর চিড়িয়াখানা, পুরনোজীব। দোকানদার বনমালির ভাষায় – পারিজাতের চিড়ীয়াখানায় জত সব চিড়িয়া'। কে গুপ্তের উক্তির – 'মশাই! আমরাও রিফুইজি ছাড়া আর কিছু না। অর্থাৎ বারো ঘাটের জল খেয়ে আসা বারো ঘরের উদ্বাস্তুই উপন্যাসের সকল চরিত্র।'

জ্যোতিরিন্দ্র মধ্যবিত্তের অন্তঃসারশূণ্য, মানসিকতা ও বিপন্নতা দেখানোর জন্যই এই তৃতীয় উপন্যাসটি লেখেন। সংকীর্ণতায় আবদ্ধ ক্ষুদ্রক্ষুদ্র স্বার্থনিয়ে বাঁচা মানুষগুলি কথা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়েও বিচ্ছিন্ন নয়। লেখকের ভাবনায় –

১) একটা জাহাজের মতো মনে হয় বাড়িটাকে। বারোটা কামার জাহাজের বারোটা কেবিন। কোনোটার আলো জবলছে। কোনটায় অন্ধকার আকাশের নীচে সাঁতার কেটে চলেছে জাহাজটা।

২) যাত্রীদের বিভিন্ন অবস্থা বুকে নিয়ে জাহাজ বাড়িটা রাত্রির গাঢ় জলে সাঁতার কেটে চলছিল

৩) মস্ত বড় উঠোন বুকে নিয়ে বারোটা ঘর রাত্রির জলে সাঁতার কাটছিল।

সুতরাং বারোটি পরিবার জাহাজেরই কেবিন। সেইক্ষেত্রে জাহাজ হয়ে উঠেছে উঠোন। অর্থাৎ সামগ্রিক্তায় উপন্যাসটির নামকরণ সার্থক।

যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন সূত্রানুসারে যারা প্রকৃতির দ্বারা নির্বাচিত হয় তারাই টিকে থাকে, অন্যরা হারিয়ে যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষকেও অভিযোজন করে বেঁচে থাকে। প্রত্যেকটি চরিত্রকেই এখানে দেখা যায় সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেকে পরিবর্তন করতে নিতে। খাপ খাইয়ে নিতে। পারে না শুধু কে গুপ্তের পরিবার। মহানাগরিক মধ্যেও তো মার্কস কথিত শ্রেণী সংগ্রাম অনিবার্য। এই জীবন সংগ্রাম খাদ্য নারী বাসস্থানকে কেন্দ্র করেি তো দানা বাঁধে। হারিয়ে যায় রুন, রমেশ; শুধু এরাই তো

নয় যারা ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে গেল মহানগরীর কোহাহলের মধ্যে তাদের আর আমরা খবর রাখি না। 'মহাসাগরের নামহীন কুলে হতভাগাদের বন্দরটীতে' হয়তো তাদের জাহাজ ভিড়বে। আমরা আর তাদের চিনতে পারবো না। শুধু একটি পরিবার নয়। এই সময়ের এই মানুষগুলোই এভাবে মহানগরীর কালো ঘবরে হারিয়ে যায়। প্রেতের মতো ঘুরে বেড়ায়।

মানুষের মৃত্যু হলেও তবুও মানব
থেকে যায়; অতীতের থেকে উঠে আজকের
মানুষের কাছে প্রথমত চেতনার পরিমাপ নিতে আসে।

(জীবনানন্দ দাশ)

১৩.৩ অনুশীলনী

১) বারো ঘর এক উঠোন উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শিবনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দাও।

২) বারো ঘর এক উঠোন উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হিসাবে শিবনাথ কি আদৌ গ্রাহ্য করা যাবে যুক্তি সহ ব্যাখ্যা কর।

৩) বারো ঘর এক উঠোন উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

১৩.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১) সমাজ আলেখ্যঃ বারো ঘর এক উঠোন – রানু বিশ্বাস, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

২) বাংলা সাহিত্য পরিচয়, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তুলসী প্রকাশন।

৩) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দেবেশ কুমার আচার্য, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি।

একক - ১৪ সামাজিক উপন্যাস বিচারে বারো ঘর এক উঠোন

বিন্যাস ক্রম

১৪.১ সামাজিক উপন্যাস বিচারে বারো ঘর এক উঠোন

১৪.২ ভাষা ও শৈলীগত বিচারে বারো ঘর এক উঠোন

১৪.৩ অনুশীলনী

১৪.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১৪.১ সামাজিক উপন্যাস বিচারে বারো ঘর এক উঠোন

"স্যোস্যাল কমিটমেন্ট যদি কোনো শিল্পীর তুলি সবভাবত এসে পড়ে – তবে তা সমাজ ও জীবনের পক্ষে কল্যাণকর শিল্প ও সেখানে পুরো মাত্রায় সার্থক। কিন্তু একটা স্যোসাল কমিটমেন্ট যদি শিল্পের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে তাহলে সামাজিক দায় দায়িত্ব পালনের প্রশ্নটি প্রাধান্য পায়। শিল্প দৃষ্টির ও কৃষ্টি সেখানে গৌণ হয়ে ওঠে – শিল্পের সজীবতা সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যায়।" (উজ্জ্বল উদ্ধার আশবিন অগ্রহায়ণ ১৪ঃ১০ পৃঃ ৪৯ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী)।

যে উপন্যাসে সম্পূর্ণ বাস্তব সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তথা সামাজিক সমস্যা ও তপদ্দজিত প্রতিক্রিয়া, ফলত অরিত্র সমুহের মানস বৃৎেত্রর ভাংচুর ইত্যাদি প্রাধান্য পায় তাকে সামাজিক উপন্যাসারূপে চিহ্নিত করা হয়। এ জাতীয় উপন্যাসের চরিত্ররা অধিকাংশ টাইপ ধর্মী ও উপন্যাসের বাস্তবতা তথা সমস্যায় আলোড়িত। এ প্রসঙ্গে সমালোচক আব্রামস বলেছেন – "The Sociological novel emphasizes and even." অর্থাৎ সামাজিক অর্থনোইতিক সমস্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন এই শ্রেণিঢ় উপন্যাসের প্রধান লক্ষ্য।

সমাজ ও অর্থগনৈতিক প্রভাব সামাজিক উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনার উপর পড়ে থাকে এবং সৃষ্টি করে জীবনের সংকট।' সামাজিক সংস্কারের প্রচ্ছন্ন আদর্শ ও কল্পনা এই সামাজিক উপন্যাসে থেকে যায়। এই রাজনৈতিক ব্যাপার প্রাধান্য পেলেও এই ধরনের উপন্যাস সমাজ পরিবর্তনের ইঙ্গিত থাকে। 'সাহিত্য সন্দর্শন' শ্রীশচন্দ্র দাস পাশ্চাত্য ভাবপ্না অনুযায়ী উল্লেক্লহ করেন – "যেন উপন্যাসে সমাজ রাষ্ট্রীক পরিবর্তন ও ধর্ম সম্বন্ধীয় কোনো বিষয়বস্তুর অবতারণা থাকে, তাহআকে সামাজিক উপন্যাস কহে" এই মত পোষণ করেছেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমাজ চিত্র প্রধান সামাজিক উপন্যাসে দুটি পূর্ণ গত শ্রেণি কল্পনা চলে । প্রথম টিতে ঔপন্যাসিক প্রচলিত সমাজ পটের প্রতিষ্ঠা ভিত্তিতে আঘাত হানেন. যেমন থ্যাকারে। ২য় টিতে সমাজের পূর্বস্থির মূল গুলির ক্ষেত্রে নূতন প্রশ্নের উদ্ভবকে লেখকে জাচাই করেম। যেমন জজ ইলিয়ট। সামাজিক উপন্যাসে লেখকের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নিজসত্তায় তার চরিত্র গুলি ব্যক্তি সবরূপের রূপায়ণ রসগত বিশিষ্টতা লাভ করে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে সমাঝ বাস্তবতা কতটা ভাবায় তা একটা সাক্ষাৎ থেকেই স্পষ্ট হয় কালপুরুষ আপনি জানেন একটা তর্ক বহুকাল থেকেই চলে আসছে সেটা হল কলা কৈবল্য আর্ট ফর আট্রস সেক, এবং বাস্তবয়াত এবং সমাজ সচেতনতা। আপনার কি মনে হয় সাহিত্য বা শিল্প সৃষ্টির ব্যাপ[আরে এ ধরনের কোন মতবাদ মানার প্রয়োজনীয়তা আছে?

জ্যোতিরিন্দ্র – কিছু কিছু লেখক এই সব মতবাদ কে প্রাধান্য দিয়ে লেখেন বৈকি। আমার মতে সাহিত্য চর্চায় সমাজ সচেতনতা, সৌন্দর্য বোধ ও মূল্যবোধ এই সমস্ত কাজ করবে। ওই কৈবল্যের ব্যাপারটা ঠিক বুঝি না... বাস্তবতা, সমাজ সপচেতনতা ও শিল্পবোধ একসঙ্গে মিশেল হয়ে কাজ করবে। এক তপ্রফা কেউ বা কারা যদি লিখে থাকেন তবে তাকে প্রকৃত সৃষ্টি বলে মনে করি না আমি। কোঞ্জ লেখককে স্বতন্ত্র বলে মনে করার পিউছনে সমালোচপকের আত্মশ্লাঘা থাকে। কিন্তু ব্যক্তিমাত্রেই স্বতন্ত্র লেখক তার মধ্যেি ব্যতিক্রম। লেখক যখন যে সমাজে থাকেন তার আঙ্গিকে সমৃদ্ধ করে তোলেন সৃষ্টিকে। স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি নিরপেক্ষতা এবং পক্ষপাতে টানাপোড়েনেই সৃষ্ট

পাঠের অখন্ডোতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এমন কথা কার বাংলা কথা সাহিত্যে আছেন যারা বিষোয় নৈপুণ্য ছাপিয়ে যান দেশ কাল এমনকি সমাজ ও আঙ্গিক ও তাদের সহজাত। এমন একটি ভুবন সৃষ্টি করে জেটা সমাজে সমষ্টইর অনুসৃত হবার ব্যষ্টির স্ব কল্পিত অন্তর্মুখীনতার পরিধি জুড়ে মেঘ করে থাকা বহির্মুখী সম্পর্ক গুলি নিয়ে সেখানে সম্পর্ক তৈরি হয়। সমাজ সম্পর্কের ধারক ও বাহক। সম্পর্কের বিবর্ধিত প্রকাশ মানব স্মপর্ক। এখানে টানাপোড়েনের সমক্রিয়ত নিষ্ক্রিয়তার তৈরি হয় গল্প। অন্তর্মুখী সম্পর্কের গল্প দেখা যায় জীবনানন্দেঢ় লেখায়। সেখানে বাইরের সমাজের ক্লীনতা গ্লানি ব্যষ্টির অনুভহবে অনুসৃত থেকে যায়। বিংশ শতাব্দির কলকাতা কেন্দ্রিক কথাসাহিত্যকে কেন্দ্র করে তর্ক বিতর্ক মধ্যবিত্ততা একটা বড় বিষয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশের প্রশ্ন ধরেই এ উতরের দিকে এগোনো যায় উৎপাদন সপম্পর্ক ও উদ্পাদন ব্যবস্থার সংযোগ শিথিলতা সে ক্রমান্বয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। এই বিছিন্নতা অন্তর্মুখী। ইউরোপীয় নগরায়ণ ও পুঁজি সভ্যতার এক চেটিয়া বাজার অর্থনীতি আবর্তে সমাজ ভাঙ্গে, রূপান্তরিত হয় অনেক নতুন কলোনী কিন্তু ভারতবর্ষে বিশেষত বাংলায় সমাজ পরিবর্তন ভাবগনের শিল্পরূপ সেখানে মোহটাই বেশি, কার্যক্ষমতা কম। এই সমাজ কে বুঝগতে হলে জীবনানঞ্জদ মানিক জগদীশ গুপ্ত প্রেমেন্দ্র অচিন্ত্যর পাশাপাশি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অসতর্ক পাঠ দরকার। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী কোন সমাজের কোন মানুষদের ধরছেন তা স্পষ্ট করেননি, শুধু বলেছেন –

“বিপন্ন বিপর্যস্ত অবক্ষয়িত সমাজের মানুষগুলির শুধু বেঁচে থাক্র জন্য কোন রকমে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য, কতটা অন্ধকারে কতটা নীচে নেমে যেতে পারে, আমি তাই দেখিয়াছি। ”(আমার সাহিত্য জীবন, দেশ ১৩৮২)

কারণ এই মধ্যবিত্তের খয় ও অবসাদই লেখন বিশ্বের কেন্দ্রীয় বিষয় কারণ –

আমি তো মধ্যবিত্ত মানুষ কাজেই এই জীবনের সঙ্গে যতটা পরিচয় অন্য জীবনের আমার ততটা পরিচয় নেই, সুতরাং এখানে আমাঢ় কলম বেশি করে জাগে এটাই স্বাভাবিক। এটা তো ডেকাডেন্স অবক্ষয়ের যুগ।

কিন্তু তিনি শুধু রূপকার মানুষের স্বজ্ঞানে তিনি Involve লেখক নন। আমরা জানি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্‌পাদন প্রণালী এবং উদ্‌পাদন সম্পর্ক যা বৃহত্তর অর্থে ব্যক্তি সমাজের অলঙ্ঘনীয় ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে, তার ব্যষ্টি মন কে করেছে বিচ্ছিন্ন তাই ব্যষ্টি তাই অটোমেশনে পরিণত হয়ে প্রত্যক্ষ প্রবাহে ভেসে চলেছে। পাশ্চাত্যের মনো তাত্ত্বিকেরা মনে করেছেন, এই সর্বগ্রাসী বিচ্ছিন্তার ফলেই নির্জ্ঞান প্রভাবিত ব্যষ্টিমানুষ নিঃসঙ্গ এবং আন্তর্জাতিক পুঁজি প্রিচালিত যন্ত্রমানবের হাতের ক্রীড়নক, তার এই অসহায়ত্ব মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আরও বেশি প্রযোজ্য, অধিমনবিদ্যা সামাজিক পরিবর্তনের মূলে যে দ্বন্দ্ব তার সংকটকে অনুধাবনে ব্যর্থ। অথচ অবক্ষয়ী মূল্যবোধ যখন প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে তখন সমাজে তৈরী হয় আলোড়োন। নিতান্ত ব্যক্তিক স্তরে প্রায় নিরুচ্চার থাকে এই অবক্ষয়ী মূল্যবোধের প্রশ্নগুলি। জ্যোতিরিন্দ্র অন্যান্য বিশ শতকীয় গল্পকারের মতো তাকে তুলে ধরেন কিন্তু তার রূপায়নে থাকে নীরব নির্জন ব্যক্তির প্রতিবাদ।

মানুষ ও কুত্তাতে

ডাস্টবিনে ভন্ন চাটি একসাথে

হাজ্র জনের অন্ন মারা কয়েক জনের সভ্যতা

এই আমাদের ভব্যতা। (দীনেশ দাস)

কবি বিষনু দে ‘স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত’ এ যাকে চৈতন্যের মড়ক বলেছিলেন সমাজতাত্ত্বিক বিনয় ঘোষ ‘মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ’ নামক গ্রন্থেরস্বেটড়োপলিতটন মন নামক প্রবন্ধে এই সময়ের কথায় লিখেছিলেনঃ

“কলকাতার মেট্রোপলিটন স্তরের বিকাশ আমরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দেখেছি। ... সমাজ জীবনের অখন্ডোতা নাগরিক জীবনের স্তরে খন্ড খন্ড হয়ে যায়, টুকরো টুকরো অনেক সমাজ গড়ে ওঠে, গড়ে ওঠে, হয়তো অনেক কাছাকাছি, তবু অনে হয় দ্রুত লোক সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে। চারিদিক থেকে লোক যেন পড়ি কি মরি করে ছুটতে থাকে। শহরের দিকে জীবিকার ধান্ধায়, স্বার্থের ধান্ধায় এমনকি নির্ধাধায় নোইরাজ্যের গা

ভাসিয়ে দেবার ধান্ধায়।" জীবনানন্দের ১৯৪৬-৪৭ কবিতায় এই সময়ের মানুষের অভুব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। এই সময়ের পটভূমিতেই ''বারো ঘর এক উঠোন উপন্যাস্টির জন্ম। এক সাক্ষাৎকারে লেখক স্বয়ং ধরিয়ে দিয়েছেন সেকথা, "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দেশভাগের অভিশাপ, আঘাত, যন্ত্রণা ও অবক্ষয় আমার লেখায় ধরতে চেয়েছি, বিশেষ করে সূর্যমুখী, বারো ঘর এক উঠোন ও মীরার দুপুর এই তিনটীতে।" একই বক্তব্য আমরা শুনি উপন্যাসে।

'না-আমার বক্তব্য ক্রাইসিস ফ্রাস্তেশনের যোগ বিয়োগ সমাজ বিজ্ঞানীরা আধুনিক সমাজের যে চিত্রই আঁকুন, আমরা তো চোখের ওপর দেখছি আমাদের আধুনিক সমাজটা কি দাড়িয়েছে, কেমন এর চেহারা হচ্ছে দিন দিন, রেসিডেন্সীয়াল হাউসের অভাব দুর্ভিক্ষ, বেকার সমস্যা তো আবাব্র এদিকে এই ডামাডোলের বাজারে ভাল মন্দ ইতর ভদ্র শিক্ষত অশিখত সব মিশে জগাখিচুড়ি হয়ে যাচ্ছে, আমামদের এই লোয়ার মিডল্কলাস সোসাইটি' – বিধুমাস্টার।

আজ শতবর্ষ পেরিয়ে এসে আজ অনুভব করতে পারি, সময়সচেতন এই লেখক বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতাকে এক বৃহত্তর ও সর্বজনীন চেতনার জগতে নিয়ে যেতে চান। বিশ শতকের মধ্যপর্বে যখন সময় অনেক বেশি উতকেন্দ্রিকতায় আক্রান্ত সেই অস্থির জীবনপটেই উপন্যাসের আঁধার হিসেবে স্থাপন করলেন জ্যোতিরিন্দ্র 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসে। এই উপন্যাসের পূর্বে তিনি কিছুদিন একভাড়াবাড়িতে বাস করেন – তিনি জানেন যে কোনও লেখকই সমসাময়িক জীবন থেকে তার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন – আর্থিক সংকট ও দেশভাগজনিত নানা সমস্যার দামাডোলে বারো ঘর এক উঠোন এর প্রধান কুশীলব শিবনাথ এর চাকরী গেছে, উপন্যাসে শেখর ডাক্তার রোগীর খোঁজে শিবনাথ সুদ্ধু আমাদেরকে সময়টা জানায় – 'ফট্টি নাইন ফাঁক গেছে, ফিফটিতে কিছু হয়নি, কিন্তু এবার? অর্থাৎ এই অদ্ভুত বাজারে 'রেসিডেন্সিয়াল' হাউসের সমস্যা দুর্ভিক্ষ বেকার সমস্যা তো আছেই' ফলে সামাজিক মানুষ আশ্রয় নেয় একটি কমস্থানে যেখানে তার অর্থের স্বাচ্ছল্য হয়।

উপন্যাসে শিবনাথ তার স্ত্রী রুচি এবং কন্যা মঞ্জুকে নিয়ে পাড়ি জমায় সেখানে, যেখানে ‘মশা থাকবেই, শহর তো নয়, শহরতলী। শহরের জত জঞ্জাল আর আবর্জনা ঠেলে টেলে ওদিকেই পাঠানো হচ্ছে। কলকাতার ভদ্রপল্লীতে আর তাদের হয় না। ৪৫ টাকা বাড়া বাড়ী ছেড়ে ১৮ টাকায় কুলিয়া টেংরা বস্তিতে উঠে আসছে সকালে। এখন সমাজে নিম্নবৃত্ত বা মধ্যবিত্তরা যদি বস্তিতে থাকে, তাহলে শহরে কারা থাকে –

কম লেখাপড়া করে যুদ্ধের সময় বড় চাকরি বাগিয়ে ফেলেছিল, তাই ব্ল্যাক মার্কেটিং ব্ল্যাক মার্কেট না করলে রোজ এত মাংস খাওয়া আর নিত্যনতুন শাড়ী গয়না পরা বেড়িয়ে যেত। সুখের পায়রা সব।’

আর অন্যদিকে শহুরে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য থেকে যারা বঞ্চিত হতে বাধ্য হয়, সেই এক উথোনের ভাড়া বেকার স্বামীর সংখ্যায় খুব বেশি নয়, যদিও দুতিনটে দুপুরবেলা ঘর থেকে ছেলেমেয়ে দেখবে ঘর দরজা পরিষ্কার করে, ফাকপেলে কল থেকে ঘড়া ভরে জল নিয়ে আসে...

অভাবের জন্য সাকার পুরুষেরা অর্থের জন্য অন্য উপায়ও খোঁজে। বিধুমাস্টার যেমন প্রাইভেট ট্যুইশনি খোঁজে। অতিরিক্ত পড়িয়ে টিউশুনি জোগার করে ‘একটা মাস কুকুরের মত্য খাটলে কুড়ি টাকা। এই টিউশুনির বাজার। কারণ বাজারদর অনুয়ায়ী চাহিদাঢ় জোগান বেশি। সেই স্কই বাজার পারিজাতের বাড়িতে দেখা গেছে। কে গুপ্ত ও বিধু মাস্টার পারিজাতের টিউশন না পেয়ে, শিবনাথ পায়। বস্তির আরেক কর্মযোগ্য পুরুষ শেখর ডাক্তার রোগীর জন্য কলেরা প্রত্যাশা করে বস্তিতে। রমেশ চা দোকানের আড়ালে চোরাকারবারের লিপ্ত হয়। আবার নগর পুরীয়ে যেমন দেবালয় রক্ষা পায় না তেমনি অমলের বেকারত্বের সুযোগে তার সুন্দরী স্ত্রী করণ চারুর রক্ষিতা হয়। প্রীতি চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, বীথিকে মিহিরবাবু ভোগ করে। বেবীকে খিতিশ আটকায়, যদিও ক্ষিতিশ খুনি হলে তার শিকার হয়। পাশাপাশি বস্তিতে আমরা দেখি কানাকানি, পরশ্রীকাতরতা মনের অপ্রশস্ততা হিংসা কলহ নিন্দা পরচর্চা কুৎসা, সংকীর্ণোতা লোলুপতা...’এভাবেই মানুষ ক্ষয়ের মাধ্যমেই প্রগতিতে এগিয়ে চলেছে। ‘বারো ঘর এক উঠোন’ এর বারোমাস্যাতে আমরা দেখি অমল দুইবেলা খেতে দিতে না পারলে সুন্দরী

স্ত্রী কিরণকে লাথি মারে, বিধু মাস্টার তার সন্তানদের শুয়োরের দল বলে লক্ষ্মীমণী সন্তানদের মুখে খাবার দিতে না পারায় অক্ষহায় বোধ করেন। কে গুপ্ত পুত্র রুনুর মৃত্যু কামনা করেন এবং কন্যা বেবীর বয়সন্ধিকালে ফ্রক ছিঁড়ে যায়, সেই দিকে নজর না দিয়ে, বেবী কাছ থেকে পয়সা নেবে বলে রাস্তার অপেক্ষা করে। রুনু ময়নার সঙ্গে স্বপ্ন দেখে, কিন্তু তা অধরা থেকে যায়, ময়নাও সন্তোষের কাছে বিকিয়ে যায়। কমলাঢ় কাছে দর্শন হল এদিনে এত রুচিবাগীশ হয়ে লাভ কি? বীথি শিবনাথের মানসিক অবস্থার সাথে আমাদের মানসিক অবস্থা মিলে যায়, কিন্তু একটাই দুঃখ শিবনাথও ওই দলে চলে যায়। তাহলে কি সমাজ ঐ দিকে? আমরাও কি ঐ দলের –

'জত নিচের দিকে তাকাচ্ছে শিবনাথ মানে যে সব জায়গায় শিক্ষার আলো পৌঁছয়নি, স্ত্রীলোকের সতীত্ব সম্পর্কে পুরুষেরা বড় বেশী সচেতন, সর্তক সতীত্ব যাবে মনে করে বড় বেশি সন্ত্রস্ত সব, এতাই যেন বেশি দেখছে।'

শিবনাথে ভেবেছিল সমাজের এই সমাজের এই পাঁক গায়ে মাখবে না। কিন্তু সংসারের প্রয়োজনে টিউশান বা নতুন কাজ খোঁজার চেয়ে বনমালী দোকেনে কেচ্ছে শোনা তার কাছে বেশি জনপ্রিয় হল। শেখর ডাক্তারকে এড়িয়ে গেল সুনীতির মামলার জয়েতে অথচ নিজ স্বার্থের জন্য সুবলার মারফত কে গুপ্ত স্ত্রী প্রভাতকণার সুইসাইড নোট যোগাড় করল। রমেশই তাকে পারিজাতের কাছে যাবার রাস্তাটা দেখাল, অথচ রমেশের মৃত্যুতে সে দুখিত তো হলই না ক্রমশ পারিজাতের কাছে যাবার রাস্তাটা দেখাল, অথচ রমেশের মৃত্যুতে সে নগ্নবুক সৌন্দর্য দেখে শিবনাথ সন্তুষ্ট ছিল একদা বলেছিল শুধুমাত্র বীথির জন্যই সে বস্তিতে থাকবে, সেই শিবনাথই বীথির চাকরি ও বস্তিত্যাগকে কেন্দ্র করে বলেছে, 'কেপ্ট, পাবলিক নয় পার্সোনাল ইয়ে।' অর্থাৎ শিবনাথ প্রথমে মুক্তি চেয়েছিল কিন্তু মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। তাই সমাজে থেকে সে হয়ে দাঁড়াল একঘেয়ে ক্লান্তিকর ও হীনতায় প্রতীক। ফলে ডোমপাড়ায় আগুন লাগলেও সেই আগুনের আঁচ আমরা অনুভব করতে পারি বারো ঘরের অন্দর মহলে আর রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবীর চরিত্ররা জেমন ব্যক্তিত্ব হারিয়ে নাম্বারে পরিণত হয়, তেমনি জ্যোতিরিন্দ্রের চরিত্ররা ১ ৭ ১১ চার নাম্বারে পরিণত হয়ে যায়।

বারো ঘরে নারীরা ও সমাজ অন্তরালে হারিয়ে গেছে। ধীর স্থির, সতী লক্ষ্মী পরায়ণা – নারীর ভূষোণ – সমাজ এই অলংকার তাকে দেয়। আবার সেই সমাজই নিজের চাহিদার জন্য অলংকার কেড়ে নিয়ে পংকে নিম্মজিত করে। তাই উদ্বাস্তু কমলা কোন ডাক্তারের হাত ধরেনি। বিবাহিত এক পুরুষকে বেশি বিশ্বাস করে, একই বিশ্বাস আছে সুনীতির সিফিলিস রোগীর প্রতি। জীবনযুদ্ধের বড়, টিকে থাকতে হবে – তাই বীথি প্রীতি অন্য রাস্তা ধরে। শিশু শ্রমিক বেবী সামান্য চা এর জন্য জীবনে ডেকে আনে ভয়াবহ বিপর্যয় – খুন – পুলিশ – কাস্টডি মায়ের আত্মহয়াত্যা। একটী সাধারণ ঘটনাও নারীদের মনকে কত পালটে দেয়। স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যাবে সন্তান চাইনি। খুব সহজেই তার জীবন। অন্যগতিতে বয়েছে। অথচ কমলাকে কে গুপ্ত বলেছে বেবুশ্যে কিন্তু সেই নারী সংসারের আশায় জ্ঞহর বেঁধেছে এক বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে। একই রকম হয়েও মন্টুর হাত ধরে ছেড়েছে। কিন্তু বহু সন্তানের জননী বিধুর স্ত্রী লক্ষ্মীরাণি সংসারকে সবসময় আঁকড়ে ধরেছে। তার একটাই দুঃখ সন্তানেরা বার্লি খেয়ে মানুষ হচ্ছে। কিন্তু সমাজের অভিশাপ এমনই, তিনি একটাই দুঃখ সন্তানেরা বার্লি খেয়ে মানুষ হচ্ছে। কিন্তু সমাজের অভিশাপ এমনই, তিনি যখন সন্তানেরা বার্লি খেয়ে মানুষ হচ্ছে। কিন্তু সমাজের অভিশাপ এমনই, তিনি যখন নার্সিংহোমে যান, তখনই বিধুমাস্টার বড় দুই মেয়ে মমতা ও সাধনাকে দেহ ব্যবসার জন্য ম্যাসেজ ক্লিনিকেপাঠায়। জ্যোতিরিন্দ্রের এত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জন্য সাধারণ পাঠক তাকে মেনে নিতে পারেনি। অবশ্য তাতে কোন দুঃখ ছিল না তাঁর –

‘এমন বই তাদের হাতে আমি তুলে দিতে পারি না যা পড়ে তাঁর আনন্দ পেতেন, তাদের মনে সুখের জন্ম দিত অথবা দুখের বিলাসে মন ভরে উঠত।’

এই উপন্যাসে দুই চরিত্রে আমরা উৎত্রণের ছত্রছায়া লক্ষ্য করি – বলাই ও রুচি । বলাই আদর্শ পুরুষ তাঁর মতে – “শেষ পর্যন্ত দেখব ফলের কারবার গেছে পরে সাবান ধরে ছিলুম, সাবানে সুবিধা না হওয়ায় বেগুন ধরেছি। যদি তাতেও সুবিধা না হয় লোকের জুতো সাফ করব।”

সমাজেরকাছে দায়বদ্ধ লেখইক। তাই ব্যক্তির ইচ্ছা চূড়ান্ত নয়, সমাজের কৌণীকতা ভুপস্থাপিত হয় – বলাই আর সৎ থাকতে পারতে না। পারিজাতের কাছে রমেশের মারফত চোরাচালান কাজে লিপ্ত হয়। একইরকম রুচি আদর্শ শিক্ষিকা, বস্তিনাসীদের থেকে দূরত্বে অথচ তাদের প্রয়োজনে এগিয়েও যায়। যেমন বেরির মা ডাকলে শিবনাথকে তোয়াক্কা না করে চলে যায়। অথচ সমাজের কালো অসুখ তাকেও ছুঁয়ে যায়। খুব সহজেই পারিজাতের হাতের পুতুল হয় সে, চারু রায়ের বাহুলগ্নেও তাকে খুঁজে পাওয়া যায় – সৎ আদর্শ সব ধূলায় মিশে যায় একমসময় বেবীর মার প্রসঙ্গে বলে – 'ভদ্রমহিলাই খুব খামখেয়ালি জেদী।' কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যায় আদর্শায়িত নারী বেঁচে থাকতেন রুচি কি তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারত? প্রভাতকণার মতো আদর্শায়িত নারী সমাজে অচল, তাই তো উপন্যাসে তিনি আত্মহত্যা করেন এটাও সমাজের ফলশ্রুতি – সময় ও পরিসর এখানে থেকে যায়।

সমাজ জীবনের সেই ত্রুটি এনবং আত্মঘাতী বিভ্রান্তি গুলি প্রতি যে অসাধারণ নৈপুণ্যে তিনি এখানে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যদি বলি তাঁর সমগোত্রীয় আর কোন লেখকের পখেই তা সম্ভব হয়নি, তো কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলা হবে না। মানবচরিত্রের দুর্জ্ঞেয় রহস্যগুলো উন্মোচনে, এবং তাঁর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণর কাজে তিনি অনন্য সাধারণ দক্ষতার অধিকারী; এবং শেষ পর্যন্ত সেই একটি অন্তঃপ্রবাহী যোগাযোগ ঘটিওয়ে অন্তঃপর তাকে এক সামগ্রিক পরিণাম রসের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তাও তিনি জানেন।

ডারউইনেরা অভিব্যক্তিবাদের মূলতত্ত্বটি ছিল অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম – Struggle for existence. আদতে হ্যাভ এবং হ্যাভনট্স – এই দুই দ্বিধাবিভক্ত সামাজিক শ্রেণির মধ্যে সরীসৃপের মতো এই হ্যাভনতোদের লড়াই অন্যমাত্রা আত্মকেন্দ্রিক – সেখানে মনুষ্যত্ব হয় বর্জিত। এটা পরিবর্তন নয়, বিবর্তন সেই কারণে আমরা বলতে পারি সমাজ এবং সময়ের ঘূর্ণিপাকে অন্ধকারের যাত্রী কিংবা নরকযাত্রীদের কঠিন বাস্তব জীবন্ত দলিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই উপন্যাস।

১৪.২ বারো ঘর এক উঠানঃ ভাষা ও শৈলীর বিচারে

কথাসাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সর্বাথেই নতুন ঘরানার অধিকারী। ছোটগল্পে আশ্চর্য সিদ্ধির পাশাপাশি উপন্যাস রচনাতেও তিনি ছিলেন অনন্য। মৌলিক জীবন দৃষ্টি এবং তীব্রতর কারণে তাকে বরাবরই নিঃসঙ্গ লেগেছে। একটি সাক্ষাৎকারে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বলেছিলেন, "আমার লেখা এক অর্থে আমার আত্মজীবনী।"সবাভাবিকই সযত্নে কখনও বা নির্মমতায় তিনি বুনেছিলেন তাঁর সময়কে – যে সময়ের শরীরে লেগে আছে ক্রমবিস্তারি নগর সভ্যতার মোহ, চমক লোভ পাপ ক্লান্তি। পুরোনো মূল্যবোধের বিপর্যয়, মনোবিকল্প তাঁর তীক্ষ্ম নজরে ধরা পড়েছে বারংবার। একের পপ্র এক ছোটোগল্প উপন্যাস সাক্ষ্য দিয়েছে এসবের। তিনি এমন এক স্রষ্টা যিনি পরিধির মধ্যে বদ্ধ রাখেন নি। নিজের মননকে বিকশিত করেছেন বৈচিত্র্যময় তথা জীবন অনুভবের আকাশে। আশৈবব স্মৃতি তাঁর গ্রাম্য অথচ কর্মসূত্রে নাগরিক – তিনি এই বিচিত্র সমীকরণের ফসল তাঁর সাহিত্যগুলি। দীনবন্ধু কর্মসূত্রে ডাকহরকরা হোয়াতে মেঠো ও ব্রাম্ভ সংলাপ জীবন্ত করেছিল তাঁর নাটোক গুলিকে। এঁকেছেন জ্যোতিরিন্দ্রও ইট কাঠ পাথরের জঙ্গলের নিশাহপেষীত মানুষকে। প[রকৃতির বুকে করেছেন সেখানে মানুষ কত নিঃসঙ্গ কত ইন্দ্রিয় সচেতন। ইনি রাবীন্দ্রিক অথচ সতন্ত্র। এক কথায় তাঁর তুলনা তিনি নিজেই, তাই সহজেই বলা যায় – "জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর গল্প প্রথম থেকেই ছিলেন প্রসঙ্গ ও অনুকরণ উভয় এই একজন নিষ্ঠাবান সচেতন পরীক্ষক ও নিরীক্ষক। এই পরিক্ষকের কলমে উঠে আসে নাগরিকের ভাষা - যা প্রকাশ হয় কবিত্ব অথচ ছোটকথা, ছোটকথা, ছোটোকথা। তিনি বাস্তব জগতের সাথে ভাবনা জগতের মেল কররেছিলেন ভাষার মাশ্যমে। এটাও সত্যি তিনি লেখকের মনোভূমির উর্বর সান্নিধ্যে অংকুরিত শিল্পসুষমা লাভ করতে ভাষা মুখ্য নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে।"

বারো ঘর এক উঠোন – এর প্রায়ই সব কয়টি চরিত্রই স্বার্থপর লোভী, আত্মমুখী। প্রকৃতির উন্মুক্ত নায়ক শিবনাথ বেকার, অথচ এতটুকু দুকিত নয়, কাজের জন্যে সময় নষ্ট করবার মতো ভদ্রলোক তিনি নন। তাঁর মতে –

"অশান্তি ভুলতে কে গুপ্ত মদ গায়, মোহিত আর এক নেশায় ডুবে আছে এবং চাকরি জোগাড় করতের না পারার ব্যথা ভুলতে আমি প্রাণ ভয়ে অশটাদশী বিথী কে দেখছি। ছপ্টদুখের জন্য ছোটনেশা।"(৩৪ অধ্যায়)

এই মন, - মানসিকতা ব্যক্তি আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে জ্যোতিরিন্দ্রের কলমে। একই অনুভব আবার এনে দেয় শিবনাথ আমাদের নাসারন্ধ্রে – ত্বকে, দ্বীপ্তিতে সে বিভোর, এই গন্ধ তেল স্নো পাউডার, সাবান, আতপ একেস নেট। এ গন্ধ থাকে ছেলেদের জনের পরও। কদমের তো অটূট স্বাস্থ্য জুবতীর দেহে। বেগবতী নদীর মতো দ্বীপ্তি রায়ের গাঁয়ের মধ্যে। ....."(একুশ অধ্যায়)

এর কিছু "শিবনাথ চিন্তা করল পারিজাত এখন কা করবে। যদি দ্বীপ্তি ঘুমিয়ে পড়ে তো স্ত্রীকে জাগাতে পারিজাত কোন মেথোড অবলম্বন করে"(২১ অধ্যায়)

লেখকের ভাষা আমাদের মনে চিন্তা ছড়ায় শিবনাথ কি কামুলক না পরিস্থিতির শিকার। উত্তর দেয় না জ্যোতিরিন্দ্র উপন্যাসে কোথায়ও, বরং বর্ণোনাতে তাঁর আগ্রহ বেশি –

"আর জেগে আছে ন নম্বর ঘর। সেই রাধাবাজারে ঘড়ীর দোকানের প্রাক্তন কর্মচারী। আলসার ও ব্যথাগ্রস্ত ভুবন।"(২১ অধ্যায়)

আর অর্থাৎ প্রথমে বাড়ির ঠিকানা তাঁর পর অতিতের কর্মক্ষেত্র এবং বর্তমানে নিয়োজিত কর্তা ব্যক্তি। তিনি এই উক্তি দিয়েই তিনি সমাজকে খুব সহজেই উপহাস করেছেন। কারণ কর্তার পরেই কর্ম ও বাসস্থান ঠিক হয়। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র কলমে উপন্যাসেঢ় নামকরণ অথবা কঠোর বাস্তবতায় বেশি উঠেছে ভাষার মাধ্যমে।

ভুবন- বলাই – রমেশ – বিধু মাস্টার – শেখর ডাক্তার – কে সবাই এঁকেছেন এই ভাবে তিনি। হঠাৎ পড়লে মনে হয় এই জবানী আসলে নগরায়ণের ফল পরিণামে জীবনের অকৃত্রিম সুধারসে বঞ্চিত মানুষের প্রতি, প্রকৃতি দেবীর বক্রোক্তি। আর অসহায় শিবনাথের উক্তি বা সবীকারোক্তি যেন এই সব আত্মবঞ্চিত মানুষের আত্মসমীক্ষা। শবনাথ প্রথমে ছিল শিকারী, ধূর্ত বিড়াল, কিন্তু ইঁদুর দৌড়ে খেলার সে

নিজের অজান্তেই শিকারে পরিণত হয়েছে। তাই চোরাবালির মত স্বামীর – স্ত্রীঢ় চোরা সম্পর্কের দিকে তাকিয়ে তাঁর অবস্থা –

“একটু অদনাম করেছে তাকে কি বল?” বলে সে এমন অদ্ভূত ভাবে স্ত্রী দিকে তাকালে যে রুচি রীতির মতো ভয় পেল।” কিন্তু স্বামীর জোড় না দিয়েই পরেই আবার মনোকষ্টকে চেপে বলল – ‘পাগল, কিন্তু না আবার ভাবব আমি, আমার অত শত ভাবলে চলে, বলে সহজ স্বাভাবিকভাবে স্ত্রীর হাতে হাত রেখে উঠোন পা হয়ে সে বারান্দায় উঠে গেল।’(তেতাল্লিশ অধ্যায়)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কথাসাহিত্যে একটি লক্ষ্যনীয় দিক ভাষা। বুননের অদ্ভূত বলা নৈপুণ্য। সমালোচক – বলেন “আশা নিয়ে সতর্কতা তাঁর(জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী) একটি বৈশিষ্ট্য। ভাষার কখনও রঙ ফলানো, কখনও রঙ ঝরানো... লেখক শব্দের ছবিতে যে একটা বারতি খুশিতে খাটেন তাতে সন্ধেহ নেই। হয়তো গল্পে চরিত্রে যা নেই, যা ফোটানো যায় নি, সেই সব ভাষায় রঙে ফুটে উঠেছে।”

জ্যোতিরিন্দ্র উপন্যাসে বাগার্থ নিয়ে সতর্ক। এখানে ধ্বনিতত্ত্ব ধ্বনিগত উচ্চারণকে গুরুত্ব দিয়েছেন। উপন্যাসে বাংলা ভাষা (ঢাকা), পশ্চিমবঙ্গ কথ্য রীতি, অংরাজি কবিতা, লোকসাহিত্য, ছড়া এবং ইংরেজি সংলাপ ছড়া ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও কোথাও ধ্বনি প্রতিকায়ন তৈরি হয়েছে।

অব্যয় পদ দিয়ে বাক্য শুরু কিছুটা আচম্বিত অকস্মৎকে বোঝায়। জ্যোতিরিন্দ্রের কলমে যেমন –

“যেন মাঘের শেষে ফাল্গুন ছুই ছুই সকালের এক টুকরো বৃষ্টির হাওয়া সৎবাদটা সকলের কানে কানে রটিয়ে দিয়ে গেল। মুখে বলতে হয়নি। হাওয়া মারফত জানাজানি হয়ে গেল,”(৩৩ অধ্যায়)

লক্ষণীয় ছুই ছুই বিশেষণ – সহজেই বলতে পারতেন ফাল্গুনের প্রককালে অথবা মারফৎ ‘মাধ্যমের বদলে এসেছে। দৃষ্টান্ত – ‘সন্ধ্যা হব হব করছে।‘ (৩৭ অধ্যায়)

১৪.৩ অনুশীলনী

১) বারো ঘর এক উঠোন উপন্যাসে সামাজিক চালচিত্র কীভাবে উঠে এসেছে আলোচনা কর।

২) বারো ঘর এক উঠোন উপন্যাসে ভাষা চিত্রণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৩) জ্যোতিরিন্দ্র নাথের সমকালীন সমাজ মানসিকতা উপন্যাসের কাঠামোয় কেমন করে উঠে এসেছে তা উপন্যাসের শৈলী বিচারে আলোচনা কর।

১৪.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১) সমাজ আলেখ্যঃ বারো ঘর এক উঠোন – রানু বিশ্বাস, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

২) বাংলা সাহিত্য পরিচয়, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তুলসী প্রকাশন।

৩) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দেবেশ কুমার আচার্য, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি।

উপসংহার

ছোটবেলার কবিতা লেখা কলেজ জীবনে সাহিত্যচর্চায় রূপান্তরিত হয়। স্বদেশি আন্দোলনে যুক্ত থাকার অভিযোগে ১৯৩১ সালে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এক বছর গৃহবন্দি থাকাকালীন তার সাহিত্যচর্চার উপরেও জারি হয় নিষেধাজ্ঞা জারি। এই সময়ে জ্যোৎস্না রায় ছদ্মনামে ‘সোনার বাংলা’ ও ‘বাংলার বাণী’ পত্রিকায় তাঁর লেখা কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হয়। ১৯৩৬ সালে সেই নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পর ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা ‘রাইচরণের বাবরি’। কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত কলেজ ম্যাগাজিনে জ্যোতিরিন্দ্রের লেখা ‘অন্তরালে’ গল্পটি প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলার অধ্যাপক সুধীর সেন তা পড়ে মুগ্ধ হলেন। পরে প্রেমেন্দ্র মিত্রের নজরে আসে জ্যোতিরিন্দ্রর লেখা। তাঁর সম্পাদিত নবশক্তি, সাপ্তাহিক সংবাদে গল্প প্রকাশের সুযোগ করে দেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর লেখা ছোট গল্প ‘ভাত’ ও ‘গাছ’ (ইংরেজিতে), ‘ট্যাক্সিওয়ালা’ ও ‘নীল পেয়ালা’ (জার্মান ভাষায়), ‘সিঁদেল’ (ফরাসিতে), ‘একঝাঁক দেবশিশু’ ও ‘নীলফুল’ (হিন্দিতে) এবং ‘বলদ’ (মরাঠি ভাষায়) অনূদিত হয়। ১৯৩৭

সালে পাকাপাকি ভাবে কলকাতায় চলে আসেন জ্যোতিরিন্দ্র। ছোটগল্পকার হিসেবে নজর কাড়ার পর ১৯৪৮-এ 'দেশ' পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন ধারাবাহিক উপন্যাস 'সূর্যমুখী'। কলেজ স্ট্রিটের বাড়িতে থাকাকালীন তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য বই 'শশাঙ্ক মল্লিকের নতুন বাড়ি'। 'সূর্যমুখী' উপন্যাসটি লেখেন রামচাঁদ লেনের বাড়িতে থাকাকালীন। বিবাহের তিন বছর পরে তিনি অতুল্য ঘোষের কাগজ 'জনসেবক'-এ কাজ করেন প্রায় তেরো বছর। তার পর লেখায় মনোযোগ দেন। তাঁর লেখার অনুপ্রেরণা ছিলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সাগরময় ঘোষ।